উপন্যাস

তনয়ার স্বীকারোক্তি

শওকত আলী

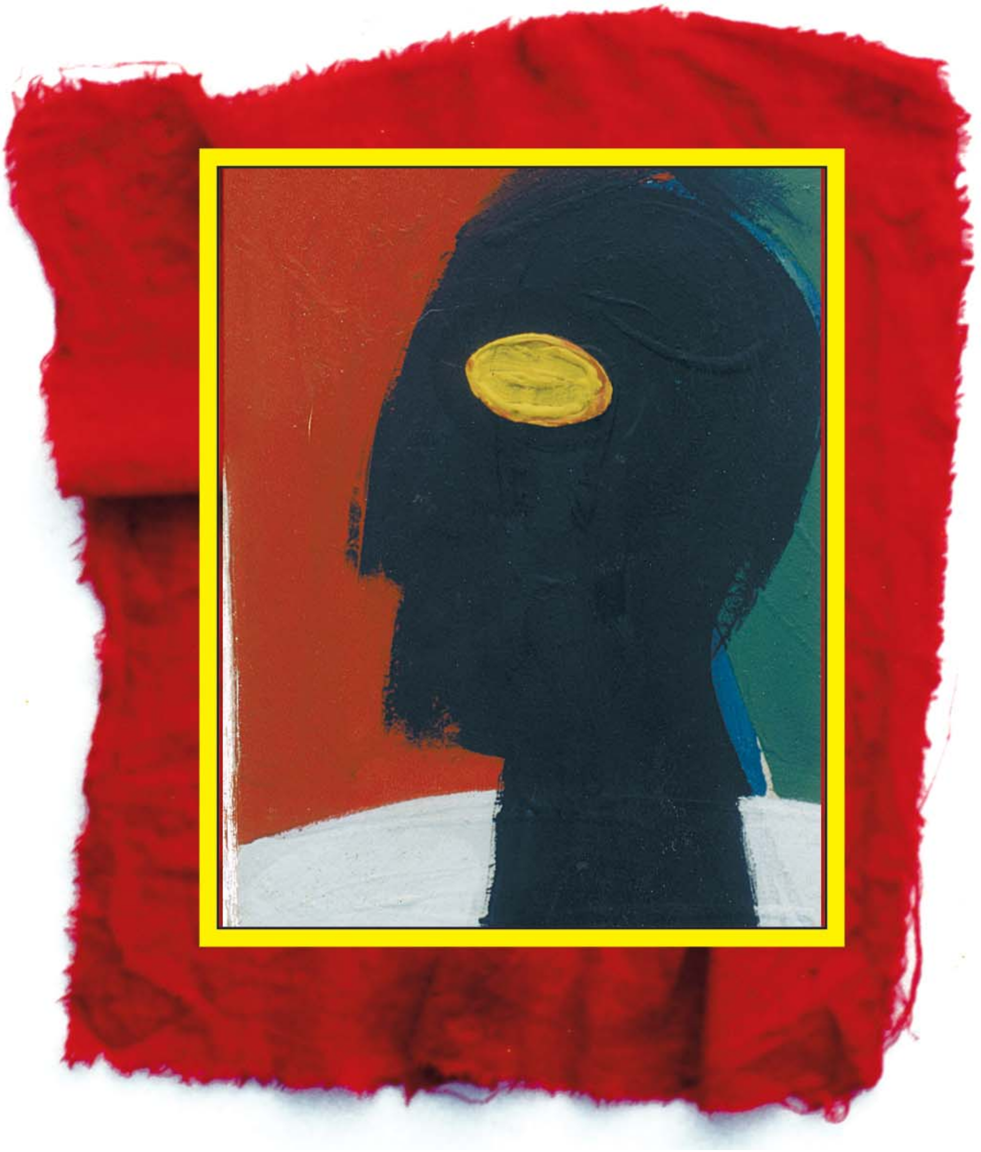

কথা ছিলো শহীদ মিনারে সে অপেক্ষা করবে, সাড়ে চারটার সময়। কিন্তু তারই তো দেরি হয়ে গেলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে পাঁচটা দশ। গাজীপুর থেকে বাসে চেপে ফিরে আসা কি সোজা কথা! প্রথম যে বাসে উঠেছিলো সেটা মাঝপথে টঙ্গীর কাছে গেলো বিকল হয়ে। তারপর অন্য বাসে জায়গা মেলে না। শেষে প্রায় আধঘন্টা পরে এক বাসে দাঁড়াবার মতো জায়গা পাওয়া গেলো। তারপর আবার জ্যাম, ২/৩ জায়গায়। শেষ জ্যাম নিউমার্কেটের কাছে। তখন সে নেমে পড়ে। তারপর ছুটতে ছুটতে আসা।

শহীদ মিনারে এসে দেখে গাছতলায় সীমা নেই। ওদিকে চত্বরে তখন কলি কিশোর নামে এক সংগঠনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সমবেত কণ্ঠের গান শোনা যায়- আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। তার মানে সম্ভবত এটাই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত, অনুষ্ঠান সবে আরম্ভ হলো। সাজিদ চত্বরে ওঠে না। গাছতলায় সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে। পাঁচটা দশ। তার মানে সে চল্লিশ মিনিট লেট।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়, তার দেরি দেখে সীমা অনুষ্ঠান দেখছে না তো? সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে সে মঞ্চের নিচে বসে থাকা দর্শকদের দেখে। বয়স্ক লোক কম, সবই বাচ্চা ছেলেমেয়ে- বড়জোর কিশোর-কিশোরী। আর যারা দাঁড়িয়ে, তারা সম্ভবত রবাহূত দর্শক। সে দাঁড়ানো মানুষের ভিড়ের পেছন দিকটা একবার ঘুরে আসে। গান শেষ হতে হতে তার এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত ঘোরা হয়ে যায়। কিন্তু কোথাও সীমাকে দেখে না। দাঁড়ানো দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা আছেন কিন্তু ওদের মধ্যেও সীমা নেই।

তাহলে ও কি আসেনি? মানে আসতে পারেনি? তার মনে সন্দেহ খচ খচ করে।

সে রাস্তায় নেমে মেডিক্যালের গেট থেকে ইউনিভার্সিটি কমার্স বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তা পর্যন্ত দু'বার হেঁটে আসে। যদি চোখে পড়ে।

কিন্তু না, সীমা নেই। গেটের ভেতরে অদূরেই দু'জোড়া ছেলেমেয়েকে দেখতে পায়। একজন বোধহয় তাকে চেনেও। নাহলে হাত তুলে হাই' কেন করলো? কিন্তু সীমা নেই- নাসিমা মুর্শেদ, মাস্টার্স ফাইনাল সোসিয়লেজি- নেই? না নেই, দেখিনি।

হ্যাঁ। ঐভাবেই প্রশ্নটা করে সে। সীমার চেনা একটি মেয়েকে। আর জবাবও ঐভাবেই পায়।

মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন স্মরণ করতে করতে খুব ধীর ভঙ্গিতে মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ায় আর বলে, সত্যিই ওকে দেখিনি।

সাজিদ ফের ঘড়ির দিকে তাকায়। আর নিজেকে বলে, নাহ্, আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। হয় ও এসে ফিরে গেছে, সম্ভবত তাড়া ছিলো, নয়তো আসতে পারেনি, কোনো কাজে হয়তো আটকে পড়েছে।

কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়, এমন তো আগে কখনো হয়নি। বরং হয়েছে উল্টোটা। সে নিজেই কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনি। সীমার তেমন কিছু অসুবিধা থাকলে আগেই জানিয়ে দিতো। এ পর্যন্ত তো এমনই হয়ে এসেছে।

সাজিদের মনে নানান চিন্তা ঘোঁট পাকাতে আরম্ভ করে। এমিনতে তো আজিমপুর কলোনি থেকে শহীদ মিনারে আসাটা বলতে গেলে কোনো ব্যাপারই নয়। রিকশা না পাওয়া গেলে হেঁটে আসতে আর কতোক্ষণ লাগে? বিকেলে ঐ রাস্তায় হাঁটতে তো এমনিতেই ভালো লাগে। তবুও এলো না কেন?

নাকি এসেছিলো? তাকে না পেয়ে ফিরে চলে গেছে? প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগে বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। কারণ নিজের মনের ভেতরেই উল্টো প্রশ্ন জেগে উঠতে থাকে। যদি এসেছিলো তো চলে গেলো কেন? কুড়ি-পঁচিশ মিনিট এমন কিছু দেরি নয় যে, বিরক্ত হয়ে বা রাগ করে চলে যেতে হবে। তাছাড়া সকালে যখন দেখা হয়, তখন চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো বড় রকমের কোনো দুশ্চিন্তায় পড়েছে। কিন্তু তখন তার নিজের তাড়া, কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিতে হবে, তারপর যেতে হবে ইন্টারভিউ দিতে, গাজীপুর। আর সীমারও ক্লাসের সময় বোধহয় হয়ে গিয়েছিলো। সে পা বাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলো, তুমি কিন্তু দেরি করবে না, তোমার ইন্টারভিউ কেমন হলো, সেটা জানার জন্যও আমার চিন্তা থাকবে, আর আমার বিপদের কথা তো এদিকে আছেই। আমি খুব চিন্তায় আছি। তুমি এসো সব খুলে বলবো।

ঐ রকম কথার পর সে আসবে না, এ কি হতে পারে? নাকি খারাপ কিছু ঘটেছে? ওর মায়ের শরীর এমনিতেই ভালো যাচ্ছে না তাঁর অসুখের কি বাড়াবাড়ি হয়েছে? হাসপাতালে-টাসপাতালে যেতে হয়েছে কিনা কে জানে। এক একবার মনে হয়, চলে যায় আজিমপুর। খোঁজটা নিয়ে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মামার কথা ভেবে মনটা দমে যায়। এমন বাজে ব্যবহার ভদ্রলোকের, যে বলার কথা নয়। আর তার স্ত্রীটি তো একেবারে রত্ন। কেন এসেছো? কাকে চাই? কী কথা বলবে? তোমরা তো এক ক্লাসে পড়ো না, তাহলে ওর সঙ্গে তোমার কী দরকার? এসব প্রশ্ন করবেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে- আর তাতে লোক জড়ো হবে।

একবার গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট। ওদিকে যাওয়া মানে জেনেশুনে বিপদের মুখে গিয়ে পড়া।

এদিকে দিন প্রায় শেষ, ছটা বাজতে চলেছে। মঞ্চের অনুষ্ঠানে তিনটি বাচ্চা মেয়ে তখন নাচ জুড়েছে, মমচিত্তে নিতি নৃত্যে, কে যে নাচে, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ। দ্রুত তালের নাচ, তবু পায়ের তাল ঠিক মতোই পড়ছে। মাদলের আওয়াজটা বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু মাইক বসানো বোধহয় ঠিক মতো হয়নি, তাই তবলার আওয়াজটাই কানে লাগছে বেশি। তবু ভালো, বেশ ভালো। হাতের মুদ্রাও একই ছন্দে বাঁধা। সাজিদ মিনিট দুই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তবে ঐ দু মিনিটই। মনে দুশ্চিন্তা থাকলে নাচ-গানে কি মন দেওয়া যায়?

সে ডাইনে-বাঁয়ে আরও কয়েকবার তাকিয়ে দেখে। ঐ সময় পেছন থেকে তার নাম ধরে কে যেন ডেকে ওঠে। বলে, আরে সাজিদ, তুই? এখানে? এই সাজু।

পুরনো বন্ধু আমিন হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘাড়ে হাত রেখে বলে, তুই এখানে কেন? তুই কি এখনও কলি-কিশোরে আছিস?

তোর কী খবর? সাজিদ পাল্টা প্রশ্ন করে, তুই তো মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গেই এসেছিস?

হ্যাঁ, আর বলিস না, ছেলেপুলেদের কান্ড। না বলতে পারি না। আমার মা ছিলেন এদের পেছনে, আমার মা তো নেই, তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস।

হ্যাঁ, শুনেছি, সাজিদ স্বীকার করে। কারণ ওর মায়ের রোগকাতর মুখখানা ঐ মুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায়। মায়ের মৃত্যু প্রসঙ্গ ওঠাতেই দুজনার মনের হালকা ভাবটা আর থাকে না। তারা অনুষ্ঠানের কথাই বলে। সাজিদ বলে, বাচ্চাদের পারফরমেন্স তো বেশ ভালো, কেমন সুন্দর নাচলো তাই না? আমিন হাসে। বলে ধন্যবাদ, তা এখানে কেন তুই? অনুষ্ঠান দেখতে?

না, এখানে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো। সাজিদ ডাইনে, বাঁয়ে নজর ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলে, কিন্তু দেখা হলো না।

কে লোকটা? আমি চিনি?

মনে হয় না, তা তুই কি ঐ নতুন কাগজেই আছিস?

হ্যাঁ, আর কী করবো? অন্য কিছু তো হচ্ছে না- তুই?

লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে সাজিদ। বলে, না আমার কপালে এখনো কিছু জোটেনি।

তাহলে কী করছিস? প্রাইভেট টিউশনি?

হ্যাঁ, ঐ রকমই বলতে পারিস। কোচিং সেন্টারে ক্লাস করি।

আমিন বন্ধুর চোখ চোখে রেখে করুণ হাসি হাসে। বলে, কী অবস্থা আমাদের, তাই না? তোর ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস, কিন্তু কোথাও জায়গা হয় না।

তুই কিন্তু ভালোই করেছিস সাজিদ বলে, আগেভাগে ঢুকে পড়েছিলি, আমারও উচিত ছিলো তোর মতো অনার্সের পরপরই খোঁজখবর নিয়ে কোনো লাইনে ঢুকে পড়া ।

আমিন হাসে। বলে, আরে ভাই আমাকে তো ঢুকতে হয়েছে আব্বার পীড়াপীড়িতে আর প্রেমের ধাক্কায়। আমি কি হিসেব-টিসেব করে ঢুকেছি? আব্বা ছাত্র জীবনে খবরের কাগজে কাজ করতেন, সেই স্মৃতি ভুলতে পারেন না। তার পুরনো বন্ধুরাও আছে ও লাইনে, ওরাই আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

তাতে কি? সাজিদ বলে, সাংবাদিকতা কি হেলাফেলার কাজ নাকি?

মানুষকে বলতে তো পারিস যে তুই একজন সাংবাদিক।

আরে নাহ্। কী যে বলিস, আমিন দুঃখের কথা বলে। তিন বছর হতে চললো, এখনও অ্যাপ্রেনটিসই রয়ে গেছি, কেউ পাত্তা দিতে চায় না, বেতনও কম দেয়।

আরে ও নিয়ে কেন খামোকা ভাবিস, এতোদিন ধরে আছিস, পাত্তা না দিয়ে কি পারবে? তুই তো তবু একটা লাইনে ঢুকে পড়েছিস, আর আমার অবস্থা দেখ, দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে চলেছি, কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না।

তা কেন? টিচিং কি কোনো লাইন নয়? আমিন যুক্তি দেখায়। কোচিং সেন্টার তো স্কুলের মতোই, ক্লাস করতে হয় রীতিমতো, সেটা চাকরি থেকে কম কিসে?

একটু থেমে হঠাৎ মনে পড়ার মতো বলে আমিন। আচ্ছা, তুই না বিসিএস দিয়েছিলি?

হ্যাঁ, দিয়েছিলাম গত বছর, সাজিদ জানায়।

রেজাল্ট? আমিন চোখে চোখে তাকায়।

ভালো না, সাজিদ ফের জানায়। বলে, ভাইভাতে টিকতে পারিনি।

এবার দিবি না?

হ্যাঁ, দেবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোনো লাভ হবে না, তা এখনই বলে দিতে পারি।

বাহ্ কেন লাভ হবে না, তোর মতো ভালো রেজাল্ট আর কয়জনের আছে।

বন্ধুর কথার জবাবে সাজিদ বলে, এমএ পরীক্ষায় ভালো করলেই বিসিএস পরীক্ষাতেও ভালো করবো এমন কোনো গ্যারান্টি আছে? তুই তো জার্নালিস্ট, জানিস না, কীভাবে বিসিএস পরীক্ষা হয় আর তাতে কীভাবে পাস করে ছেলেমেয়েরা, আর চাকরি কীভাবে পায়? কোশ্চেন পেপার ফাঁস হওয়ার খবর তোরা তো দেখি হেড লাইন করে ছাপাস।

যদি জানিসই এতো সব, তাহলে পরীক্ষা দিস কেন? আমিন চোখে চোখে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

তবু দিই, সাজিদ হাসে। বলে, যদি লাইগা যায়। লটারির মতো আর কি।

হাসাহাসি করার মতো কথা। কিন্তু মন খোলা হাসি কারুর মুখেই শোনা যায় না।

আমিন বন্ধুর ঘাড়ে আবার হাত রাখে। বলে, লোকে বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে যাই বলুক, তুই কিন্তু পরীক্ষাটা দিয়ে দিবি বুঝলি? অবহেলা করবি না।

ঐ কথার পর তারা হাঁটতে শুরু করে। সাজিদ শেষবারের মতো পেছনে তাকায়, যদি সীমাকে দেখা যায়।

রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে ততক্ষণে, অল্পক্ষণ পরেই মাগরিবের আজান শোনা যাবে। ওদিকে তখন মঞ্চে শেষ গান হচ্ছে। একটি ছেলে ভাওয়াইয়া গাইছে, ও মোর গাড়িয়াল ভাই, হাঁকাও গাড়ি চিলমারির বন্দর। ঐ গান কানে আসার জন্যই কি না, ঠিক বোঝা যায় না। দুজনেরই পায়ের গতি শ্লথ হয়ে যায় দু'জনেই ফের দাঁড়িয়ে পড়ে।

বেশ গাইছে। তাই না? আমিন পেছন ফিরে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলে।

হ্যাঁ, সাজিদ স্বীকার করে। তারপর বলে, ছেলেটা মনে হচ্ছে রংপুরের দিককার। ঠিক না?

কেমন করে বুঝলি? আমিন অবাক হয়।

উচ্চারণ শুনে, সাজিদ বন্ধুর চোখে চোখে তাকায়। বলে, জানিস না, আমরা জলপাইগুড়ির লোক-

গান শেষ হলে সাজিদ আবার বলে, অনুষ্ঠান তো মনে হচ্ছে এখনই শেষ হবে, তুই কি ওদের সঙ্গে ফিরবি? নাকি এখন অফিসে যাবি?

বাহ্ ওদের সঙ্গে ফিরবো কেন? আমিন বলে তুই. জানিস না, আমি একজন রিপোর্টার? আমার কাজ তো এখন শুরু হবে- এখানে এসেছি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে- আমাদের নিউজ এডিটর এসব অনুষ্ঠানের ওপর খুব গুরুত্ব দেন, উনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন একযাত্রায় দুই কাজ বলতে পারিস ঐ বাচ্চাদের উৎসাহ দেওয়া হলো, আবার অফিসের দায়িত্ব পালনও হলো।

তুই কিন্তু বেশ আছিস, ফের রাস্তায় পা বাড়িয়ে সাজিদ বলে, ঘুরেফিরে বেড়ানোটাও তোর কাজের মধ্যে পড়ে। তোকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

বলিস কি? আমিন বন্ধুর ঘাড়ে আবার হাত রাখে। বলে, খবরের কাগজে আসবি?

তার মানে? সাজিদ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, যাবো বললেই যাওয়া যায়? এতো সহজ?

না সহজ নয়, আমিন স্বীকার করে। তারপরও বলে, তুই তো ইংরেজি, বাংলা দুটোতেই ভালো লিখতিসও- একটু চেষ্টা করলেই চান্স পেয়ে যাবি- আমি কি কাউকে বলে দেখবো?

সাজিদের বিশ্বাস হতে চায় না। তবু বলে, দ্যাখ, যদি লাইগ্যা যায়।

আমার সঙ্গে চল তাহলে- আমিন বলে, দেখি সিনিয়রদের কাউকে পাই কি না।

বেশ, তাই চল, সাজিদ রাজি হয়ে যায়। বলে, পুরানা পল্টনের মোড় থেকে আজ না হয় বাস ধরবো।

রিকশায় উঠবার সময় মেডিক্যালের গেটের কাছে দুটি মেয়েকে দেখে সাজিদের পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। সে কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আমিন, তোর সেই বান্ধবীর খবর কী?

কার কথা বলছিস, লিমা?

হ্যাঁ, ওর কথা ছাড়া আর কার কথা বলবো? শুধু ওকেই তো আমি দেখেছি। তোদের সম্পর্ক এতোদিনে নিশ্চয়ই গাঢ় আর ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

আরে নাহ্ কী যে বলিস। আমিনের বুক থেকে লম্বা নিঃশ্বাস বের হয়। বলে, লিমাদের কি পাওয়া যায়? ওরা তো নব্য ধনী, অন্যদের সীমা ছাড়াতে দেয় না বটে, কিন্তু নিজেরা সীমা ছাড়িয়ে দিব্যি পছন্দের জায়গায় চলে যায়।

সাজিদ বন্ধুর কথা পুরো বুঝতে পারে না। বলে, তোর কথা বুঝতে পারছি না। অতো হেঁয়ালি করে কথা বলছিস কেন?

হেঁয়ালি কোথায়? আমিন বলে, প্রথমে বললো, কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করো, তারপর বিয়ে করবো- ওর জন্যই আমি অনার্স পরীক্ষার পরপরই কাগজের কাজে ঢুকে পড়লাম। অথচ তার কিছুদিন পরই জানালো, তাদের বাড়িতে সমস্যা হয়েছে, ওর বাবা-মাকে রাজি করাতে কিছুদিন সময় লাগবে। ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে সবে, এমন সময় শুনলাম এক বিজনেসম্যানের ইমিগ্রান্ট ছেলেকে বাগিয়ে নিয়ে ও চলে গেছে লন্ডনে, ওখানেই ওর সুখের সংসার পাতা হয়ে গেছে।

খুবই দুঃখের কথা। সাজিদ বন্ধুর করুণ কাহিনী শুনে চুপ হয়ে যায়। তার কাছে গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়। তার বেশ মনে পড়ে মেয়েটি ম্যানেজমেন্টের ছাত্রী ছিলো, বোধহয় তখন সেকেন্ড ইয়ার- খুব মিল ছিল দুজনায়- সব সময় একত্রে ঘুরতে ফিরতে দেখা যেতো। বেশ দেখতে ছিলো মেয়েটি। পুরো নাম ছিলো তসলিমা খাতুন। কিন্তু নামের খাতুন অংশটা বলতো না, ঐ জায়গায় জুড়ে দিয়েছিলো বাপের নামের প্রথম অংশ হায়দার। সাজগোজ করতে ভালোবাসতো আর আমিনাকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে ঘুরে বেড়াতো। সাজিদের মনে পড়ে, আমিন একেক দিন ক্লাস থেকে পালাতো, লিমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য।

দু'বন্ধু রিকশায় উঠে বসার পর একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ছ্যাঁকাটা তাহলে ভালোমতোই দিয়ে গেছে তোকে, তাই না?

হ্যাঁ দিয়ে গেছে, আমিন হাসে। বলে, চান্স পেলে কে না দেয় বল? এখন যেটা জুটেছে, সেও হয়তো দেবে?

সেকি! সাজিদ অবাক হয়। বলে, এখন জুটেছে মানে? তুই আবার প্রেম করছিস?

হ্যাঁ, করছি। ওটা তো সাধনার মতোই, একবার না পারিলে দেখো শতবার।

তা কার সঙ্গে? আমি চিনবো?

হ্যাঁ, চিনবি, আমিন জানায়। বলে, মাসুম ভাইকে মনে আছে? আমাদের সিনিয়র। দু'বছরের- খুব ভালো আবৃত্তি করতো।

বাহ্ মনে থাকবে না? সাজিদ বলে, আবৃত্তির অমন গলা আর কার আছে?

ওঁর ছোট বোন, স্বাতী, বাংলার ছাত্রী, এবার অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে- গান গায়।

বাহ্ বেশ ভালো তো! সাজিদ খুশি হয়ে বলে, তোর কপাল খুব ভালো,

বুঝলি? বেশ সুন্দর সুন্দর বান্ধবী মিলে যায়।

আমিন হাসে। বলে, হ্যাঁ মিলে যায়, তবে কলজেটাকে ওরাই আবার ছিলে দিয়ে যায়।

কী বলছিস তুই? সাজিদ মুখোমুখি তাকায়। বলে, তোর কি মনে হয় স্বাতীও তোকে ছেড়ে যাবে?

বাহ্ যাবে না, সেই জন্যই তো ওর ঐ নাম। লাথি মেরে যাবে বলেই ওর নাম স্বাতী।

দুই বন্ধু ইয়ার্কি মারতে মারতে হাইকোর্ট ছাড়িয়ে প্রেসক্লাবের সামনে পৌঁছে যায়। ঐ সময় দরকারি কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আমিন রিকশাটাকে দাঁড় করায়। সাজিদকে বলে, ভাই আই'ম সরি। এখানে একটা কাজ আছে, আজ আর অন্যকিছু করা বোধহয় সম্ভব হবে না, তুই কি দেরি করতে পারবি?

সাজিদ মনে মনে আহত হয় কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করে না। বলে, ঠিক আছে, আর একদিন আসবো, আজ এই পর্যন্ত। আমিও নেমে যাই। এখান থেকেই বাস ধরবো।

রাস্তা পার হয়ে প্রেসক্লাবের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সাজিদ। বন্ধুকে বলে, কি রে, আমি কি তোর সঙ্গে প্রেসক্লাবে যাবো?

আমিন জবাব না দিয়ে জানতে চায়, তোরা তো ঐ বাড়িতেই আছিস তাই না? কল্যাণপুরের সেই ১২ নং রোড?

হ্যাঁ, সাজিদ জানায়। বলে, পারলে এক ছুটির দিনে চলে আয়, সারাদিন আড্ডা দেওয়া যাবে।

ঐ সময় মিরপুরের বাস এসে যায় আর সাজিদও সেই বাসে উঠে পড়ে এবং বসার জায়গাও পেয়ে যায়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় কিন্তু আমিনকে দেখতে পায় না। একটু পরই বাস ছেড়ে দেয়।

বাসের সিটে বসে বসে, সে নিজের মনের দিকে তাকায়। একটা দিন তার শেষ হলো। আশা, হতাশা, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা একটার পর একটা মনের ওপর জেঁকে বসেছে। মন আর হালকা হলো না। যা কিছু করলো, দেখলো, শুনলো, সবই নিস্ফল। ইন্টারভিউর রেজাল্ট পাওয়া গেলো না। তবে বোঝা গেছে, ঐ কলেজে তার চাকরি হবে না। সীমার সঙ্গে দেখা হওয়া জরুরি ছিলো, কিন্তু দেখা হলো না। আর না হওয়াতে মনের ওপর চিন্তার বোঝাটা আরও বাড়লো। এ চিন্তার বোঝাটা আপাতত মনের ওপর থেকেই যাবে। এই ভাবেই তার দিন ফুরালো। রোজ সকালে বের হয় আর দিনের শেষে ঘরে ফেরে। শুধু যাওয়া আর আসা। মাঝখানে তার কোনো অবস্থান নেই। কীভাবে থাকবে? তার দাঁড়াবার জন্য পায়ের তলায় ভিত নেই, ধরবার অবলম্বন নেই, সামনে আশার আলো নেই। শুধুই যাওয়া আর আসা। আসার জন্য যাওয়া আর যাওয়ার জন্য আসা।

তবু ওরই মধ্যে আজ একটু নতুনত্ব পাওয়া গেলো। পুরনো বন্ধু আমিনের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হলো। তা প্রায় বছর দেড়েক তো হবেই। রেজাল্ট বেরুবার দিন শেষ দেখা হয়েছিলো ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রার অফিসের বারান্দায়। তারপর আর দেখা হয়নি। তবে ওর খবর মাঝেমধ্যে কানে এসেছে। তবে ঐ পর্যন্তই, খবর কানে আসা পর্যন্তই। দেখা তো হয়-ই নি, টেলিফোনে কথা হতে পারতো, তাও হয়নি। অর্থাৎ সে-ই কখনো ফোন করেনি। কোন খবরের কাগজে আমিনের চাকরি, সেটা তো তার জানা। ঐ কাগজের পৃষ্ঠা উল্টে ফোন নাম্বারটা লিখে নেওয়া কি খুব কঠিন কোনো কাজ! অথচ ঐ কাজটাই সে করেনি। আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকার কারণ তো সে নিজেই। আমিন কেমন সহজভাবেই প্রস্তাবটা করলো, খবরের কাগজে চাকরির ব্যাপারে সে সাহায্য করবে। প্রস্তাবটা করলো বলতে গেলে গায়ে পড়েই। এমন বন্ধু কি গন্ডায় গন্ডায় পাওয়া যায়? সে মনে মনে খোঁজে। বন্ধুর সংখ্যা তো তার কোনোদিনই বেশি ছিলো না। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বলতে গেলে পুরো ছাত্র জীবনের হিসাব করলেও বন্ধুর সংখ্যা হাতেই গুনে নেয়া যাবে। আমিন অনার্সের পর এমএতে ভর্তি হয়েছিলো বটে, কিন্তু রেগুলার ক্লাস করতো না, শুধু অ্যাটেনডেন্সের পার্সেন্টেজটা ঠিক রাখার জন্য, মাঝে মাঝে আসতো। কারণ তখন ও কাগজে রিপোর্টিং নিয়ে ব্যস্ত, ওকে বাইরেই বেশি দেখা যেতো। তবে হ্যাঁ, ঐ যে বললো মেয়েটি, ভালো নাম বোধহয় তসলিমা, ইউনিভার্সিটি এলাকায় ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতো। বাইরে থেকে ওকে দেখলে কারুর পক্ষেই ভাবা সম্ভব ছিলো না যে ও সিরিয়াস ধরনের ছাত্র। ওর বাবা অনেকদিন ধরে প্যারালাইজড্ আর শয্যাশায়ী। আরও দুটি ভাইবোন আছে। বাবা খুবই সামান্য পেনসন পান, কিছুদিন হলো, মা-ও চলে গেছেন- অথচ সবই তো তাকেই দেখতে হয়েছে। আর এখনও হচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে কি কিছু বোঝা যায়? কিছুই বোঝা যায় না। সাজিদ মনে মনে ঠিক করে, খবরের কাগজে সেও ঢুকতে চেষ্টা করবে। পারুক না পারুক, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

বাসটা সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড় হয়ে মিরপুর রোডে পড়লে, তার মনে ফের পুরনো চিন্তা জেগে ওঠে। সে কি নেমে যাবে এখানে? সীমার খবরটা কি জানতে পারবে না, ওদের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে ডাকাডাকি করবে না, মাঠেই দাঁড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। ব্যালকনিতে এসে কি ও একবারও দাঁড়াবে না? দাঁড়ালেই তো সে হাত তুলে ইশারা করবে- ব্যস তাহলেই খবরটবর যা জানবার, সব জানা হয়ে যাবে।

চিৎকার করে কন্ডাক্টর প্যাসেঞ্জার ডাকছিলো। জনা দুই লোক উঠলে, বাস আবার চলতে শুরু করে, আর তখনই সাজিদ নেমে পড়ে।

সীমাদের ফ্ল্যাটে দেখে ব্যালকনিতে বাতি জ্বলছে। শুধু ব্যালকনিতে নয়, বলা যায় সব ঘরেই বাতি জ্বলছে আজ। ব্যাপার কি? সে আন্দাজ করতে পারে না। একবার জানালায় ওর মামাকে দেখা গেলো। ওর মামানিকে কয়েকবারই এঘর ওঘর করতে দেখা গেলো। ওর মাও এলেন একবার, কিন্তু সীমার পাত্তা নেই- একবারও তাকে দেখা গেলো না।

দেখতে দেখতে ঘন্টাখানেক সময় পার হয়ে গেলো, তবুও সীমার দেখা মিললো না। তবে সান্ত্বনার ব্যাপার এই যে, সীমার সঙ্গে দেখা না হওয়ার পেছনে অসুখ-বিসুখ জাতীয় খারাপ কোনো ঘটনা ছিলো না এবং এখনও নেই, সেটা জানা গেলো।

সে ফের বাস ধরার জন্য নিউমার্কেটের দিকে এগোয়। সেখানে বাস পেতে দেরি হয় না। আর কল্যাণপুরে বাসায় পৌঁছে যায় সে ঘড়িতে দশটা বাজার আগেই।

বাবার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হতে হলো বারান্দায়, অন্ধকারে একা একা কেন বসেছিলেন সে বুঝতে পারে না। ছেলেকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন, এতো দেরি করলে কেন? কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? সারাদিন পাত্তা নেই।

একটা নতুন টিউশনির খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম, সে জানায়।

ইন্টারভিউ হয়েছে?

জি।

কেমন হলো? কিছু আশা করা যায়? বাবার আগ্রহী প্রশ্ন শুনে আমিন স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না। আর আসলেও কী বলবে সে? তাকে তো শুধু বলে দেওয়া হয়েছে যে পরে জানানো হবে। বাবাকে কি বলবে যে ওরা পরে জানাবে ওদের সিদ্ধান্ত? নাকি ইন্টারভিউ দিতে আসা প্রার্থীদের মধ্যে কী বলাবলি হতে শুনেছে, সেটা বাবাকে জানিয়ে দেবে?

কী হলো, কিছু বলো না কেন? বাবা ফের জানতে চান। বলেন, ওরা নিশ্চয়ই জানিয়ে দিয়েছে যে তুমি ওভার কোয়ালিফায়েড। ভালো চান্স পেলেই তুমি সটকে পড়বে, তাই না?

জি না, ও ধরনের কিছু বলেনি কেউ। শুধু প্রিন্সিপ্যাল বললেন, আমরা সিদ্ধান্ত চিঠিতে জানাবো।

ঠিক আছে, দেখো, শেষ পর্যন্ত কী হয়, আনসার সাহেব ছেলেকে আটকান না। বলেন, যাও ভেতরে যাও, তোমার মা চিন্তা করছিলেন। সকালে বেরিয়েছো, রাত হয়ে গেছে তবু ফিরছো না, চিন্তা হবে না? যাও, ভেতরে যাও?

মা আজকাল দিনের অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকেন, এমনিতে হাঁপানির দোষ। তারপর আবার আজকাল হাঁটুতে ব্যথা, ওদিকে ডায়াবেটিস তো আছেই।

মা ছেলেকে দেখে হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন। বলেন, সারাদিন তুই কোথায় ছিলি? তোর বাবা বলছিলেন, তোর নাকি ইন্টারভিউ দিতে যাবার কথা? কোন এক গ্রামের কলেজে? গিয়েছিলি?

হ্যাঁ মা, গিয়েছিলাম, গাজীপুর।

গাজীপুর? সেটা আবার কোথায়?

আরে আগে যার নাম ছিলো জয়দেবপুর। শোনোনি, এ জায়গার নাম বদল হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে যেন বলেছিলো কথাটা, মনে নেই। দুপুরে কোথায় খেয়েছিস? নাকি খাসনি?

খেয়েছি মা, ঐ গাজীপুরেই।

সাজিদ নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলো। ঐ সময় পেছন থেকে ছোট বোন টুনি বলে ওঠে, আচ্ছা ভাইয়া, তুই আজ শহীদ মিনারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলি কেন?

সাজিদ অবাক বোনের কথা শুনে। বলে, তুই কী ভাবে জানলি? মা, ও কি আজ বেরিয়েছিলো?

আরে না, মা হাসেন। বলেন, ওর বান্ধবী সামিনা সন্ধ্যা বেলা এসেছিলো, শহীদ মিনারে ওদের নাকি কিসের ফাংশন ছিলো। তোকে দেখতে পেয়ে ডেকেছিলো, কিন্তু তুই নাকি ফিরেও তাকাস নি। কোন এক বন্ধুর সঙ্গে নাকি কথাই বলে যাচ্ছিলি।

মা বলতে বলতে হাসেন। আবার বলেন, কার সঙ্গে কথা বলছিলি তুই তখন? কোন বন্ধু?

আমিনকে তোমার মনে আছে? এক সঙ্গে কলেজে পড়তাম। শেখ সাহেব বাজারে থাকার সময় প্রায়ই আসতো, মনে নেই?

হ্যাঁ খুব মনে আছে, কেন মনে থাকবে না? ওর আব্বা অ্যাকসিডেন্টে একখানা পা হারান। ভদ্রলোক এখন কেমন আছেন?

আমি জিজ্ঞেস করিনি, তবে ওর মা তো মারা গেছেন, সে খবর তো তোমাকে জানিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, গতবছর। মা স্মৃতি হাতড়ান আর বলেন, বড় ভালো মানুষ ছিলেন রোকেয়া আপা, বাসার কাজের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন এক সময়, তোরা তখন খুবই ছোট, খুবই উৎসাহ ছিলো তাঁর লেখাপড়ায়। নিজে বই পড়তেন, অন্যদেরও পড়তে বলতেন- ওই বই দেওয়া নেওয়া থেকেই আলাপ। পুরনো কথা বলতে বলতে মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, কেন, তোর মনে নেই? হিং টিং ছট বইখানার কথা, ও বই তো উনিই দিয়েছিলেন।

মা যেমন আবেগাপ্লুত হন, কিন্তু ছেলে অমন হয় না। সম্ভবত এই জন্য যে আমিনের সঙ্গে তার বন্ধুত্বটা ছিলো এমন এমনই সহজ আর স্বাভাবিক যে তার মধ্যে আবেগ জমবার কোনো সুযোগ ছিলো না। সে মাকে আবেগপ্লুত হতে দেখেও কিছু বলে না। দেয়ালের দিকে স্থির একটা টিকটিকি দেখে। ঐ সময় টুনি এসে তাকে উদ্ধার করে। বলে, যাও ভাইয়া মুখ হাত ধুয়ে কিছু মুখে দাও নাকি গোসল করবে? চুলোয় পানি ভর্তি হাঁড়ি চাপানো আছে। ইচ্ছে হলে গোসলও সেরে নিতে পারো।

হ্যাঁ, ইচ্ছেটা হয় তার। বাথরুমে হাত মুখ ধুতে যায়। আর হাত মুখ ধোয়ার সময়ই গোসল করার ইচ্ছেটা জেগে ওঠে। এবং ছোটবোনের কথা মতো চুলোয় চাপানো ফুটন্ত পানি ভর্তি হাঁড়িটা নিয়ে বাথরুমে যায়। বড় বালতিতে ঠান্ডা গরম মিশিয়ে খুব মজা করে ছেলেমানুষের মতো হাপুশ হুপুশ গোসল সারে সে। অমন স্নান সেরে যখন বাথরুমের বাইরে আসে তখন তার নিজেকে দারুণ হালকা লাগে। গুনগুন করে গানের কলিও বেরুতে থাকে গলা দিয়ে। রাতের খাওয়াটাও ভালোই পাওয়া যায়। তার ফলে উদরের তলদেশে যেমন, তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতেও কোমল, তৃপ্ত এবং মদির একটা আবেশ নামে এবং তার ফলে বিছানায় শরীর রাখতে না রাখতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের আগে অবশ্য কয়েকবারই সীমার কথা মনে হয়েছিলো। কিন্তু নিদ্রাচ্ছন্ন চেতনা কোনো বারই ধরে রাখতে পারেনি।

পাশের কামরায় কিন্তু মায়ের চোখে ঘুম নেই। পাশে স্বামী ঘুমিয়ে, কিন্তু তাঁর চোখে ঘুম আসছে না। কলেজে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে ছেলে, এই খবরটা জানার পর মনের ভেতরে ক্ষীণ একটা আশা জেগে উঠেছিলো তার মনে যে, চাকরিটা বোধহয় করা যাবে । কারণ, চাকরিটা কলেজের আর ছাত্রছাত্রী পড়াতে হবে । এদিকে ছেলের রেজাল্ট খুবই ভালো। এমন ভালো রেজাল্ট কয়জন করতে পারে? ছেলে ইন্টারভিউ দিয়ে এলো, কিন্তু চাকরি পাবে কি না সে ব্যাপারে তো কিছুই বললো না ছেলে? এদিকে সংসারে টানাটানির অন্ত নেই, ছোট ছেলের সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, তবে কোচিং দরকার, মেয়েটাকে কলেজে ভর্তি করাতে হবে- তারপর তার বিয়ের ব্যাপারে এখন থেকেই তৈরি হতে হবে- এদিকে কর্তাটি পেনশনে যাওয়ার পর থেকে সংসারের দিকে কোনো রকম নজরই দিতে চান না- তাঁর নিজের শরীর বলে না। কী দশা যে হবে সংসারের, যদি ছেলেটার চাকরি বাকরি না হয়, তিনি ভেবে কূল পান না।

পরের দিন ইউনিভার্সিটির গেটে সকালের দিকেই সে পৌঁছে যায়। এবং দেখাও হয়ে যায় সীমার সঙ্গে। রিকশা থেকে নেমে সে চারদিকে তাকায়, বোধহয় সাজিদকেই খোঁজে। দেখতে পেয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। মুখে হাসি নেই। বেশ গম্ভীর মুখ। বলে, আমি কাল, আসতে পারিনি, তোমার ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে?

সে অনেক কথা, সাজিদ জানায়। জানতে চায়, কাল এলে না কেন? কী হয়েছিলো?

অনেকক্ষণ লাগবে ওসব বলতে। তোমার ইন্টারভিউর কথা বলো আগে, শুনে যাই। আমার ক্লাস আছে, এক্ষুণি যেতে হবে, তোমার কি কোনো কাজ আছে? না থাকলে কোথাও বসো- আমি ক্লাসটা সেরেই চলে আসছি- যেও না কিন্তু, কোথাও।

সাজিদ বেশ কিছুটা পথ এক সঙ্গে যায়। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন সীমা আবার বলে, আমি একটু পরই এসে যাবো, তুমি ঐ বটতলায় গিয়ে বসো।

যতোক্ষণ সীমা চোখের আড়াল না হয় , ততক্ষণ সাজিদ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বটতলায় যায়। তার মনে হয় বটতলায় বসে অপেক্ষা করাই ভালো, ক্যান্টিনে গিয়ে বসলে সীমার তাকে খুঁজে পেতে দেরি হবে। কারণ ততক্ষণে ক্যান্টিনে ভিড় জমে যাবে।

সে বসে না, অলসভঙ্গিতে পায়চারি করে। আর ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। একখানাও যদি চেনা মুখ নজরে পড়ে। এতো সকালে অবশ্যি অমন কাউকে দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। শুধু হাবিব স্যারের সঙ্গে দেখা হয়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এখানে কী করছো?

এমনি স্যার, একজনকে খুঁজতে এসেছি-

চাকরি বাকরি কিছু হলো? প্রফেসর হাবিব প্রাক্তন ছাত্রের মুখের দিকে তাকান।

সাজিদ ম্লান হাসে। বলে, জি না স্যার, এখনও হয়নি।

প্রফেসর হাবিব বলেন, চেষ্টা করো, হয়ে যাবে কিছু না কিছু, হতাশ হয়ো না।

কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ কী মনে হওয়াতে ঘুরে দাঁড়ান। তারপর ইশারায় সাজিদকে কাছে ডাকেন- তারপর বলেন, এম ফিল-এ ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেছো?

জি না স্যার। সাজিদ ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলে।

কেন? হাবিব স্যার চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে প্রাক্তন ছাত্রের দিকে তাকান। বলেন, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছো পিএইচডি করবে না?

স্যার মাথাটা নিচু করে নাড়াতে নাড়াতে বলেন, না না এমন অবহেলা ভালো না। কদিন আর লাগবে বলো? দেখতে দেখতে দু'তিনটা বছর কেটে যাবে- বুঝেছো, এম ফিল-এর জন্য অ্যাপ্লাই করো। দেরি করো না। আর এদিকে পার্ট টাইম কিছু করার চেষ্টা করো। কিছু না কিছু নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।

একই ভঙ্গিতে হাঁটার সময় তাঁর পা রাস্তার পিঠে ঘষা খায়। তাতে একটু শব্দেও হয়। স্যারকে গেট পর্যন্ত গিয়ে রিকশায় তুলে দেয় সাজিদ। ফিরে আসার সময় দেখে, সীমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সে কাছে এসে বলে চলো গাছ তলায় বসি।

বসতে বসতেই সীমা বলে, জানো আমার খুব বিপদ, কী যে করবো বুঝতে পারছি না। ঐ কারণেই কাল আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে

পারিনি- আসলে আমাকে বেরুতেই দেওয়া হয়নি। মা আমাকে সারাটা বিকেল পাহারা দিয়ে রেখেছিলেন। ক্লাস করে দুপুর বেলাতেই ফিরেছিলাম। বিকেলে বেরুবার সময় মা এসে বললেন, এখন কোথাও যাওয়া চলবে না। জিজ্ঞেস করলাম কেন? তো বললেন, তোমাকে আজ বিকেলে দেখতে আসবে পাত্রপক্ষ, তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে।

বললাম, বেশি দেরি করবো না, শুধু যাবো আর আসবো।

তো মা তাও দেবেন না। বললেন, রোজই বাইরে যাস দুবার /তিনবার করে, আজ না হয় না গেলি একবার, আজ তোকে বাইরে যেতে হবে না।

সীমা মলিন মুখে বলতে থাকে, খবরটা শুনেছিলাম পরশুদিন, তাও ভাসাভাসা, তাই তোমাকে গতকাল আসতে বলেছিলাম। পশুদিনের আগের বিকেলে মামার বহুদিনের এক পুরনো বন্ধু বাসায় এসেছিলেন। উনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প করেন মামা আর মামানির সঙ্গে। মা ছিলেন না, স্কুল থেকে তখনও ফেরেন নি। ওদের আলাপের কিছু কথা আমার কানে এসেছিলো, আমি পাত্তা দিই নি। কারণ আমার বিয়ে নিয়ে কথা তো ওঁরা চেনাজানা লোকেদের সঙ্গে প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু মায়ের কাছে মামানি খুব উৎসাহ নিয়ে যা বললেন, তাতে পাত্তা না দিয়ে আর উপায় থাকলো না। যা বললেন তাতে বোঝা গেলো, পাত্রের বয়স একটু বেশি হলে কী হবে, পাত্রটি খুবই ভালো, বিলেতের এক ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করে। পিএইচডি করেছেন সাত-আট বছর আগে। ওখানে অনেক প্রস্তাব এসেছে কিন্তু সে দেশের মেয়ে বিয়ে করতে চায় না- তাই এখানে পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। পাত্রটি মামার বন্ধু আনসার সাহেবের আত্মীয়, সম্পর্কে মামাতো না খালাতো ভাই মেয়ের চেহারা টেহারা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, মোটামুটি চলনসই হলেই চলবে, তবে শিক্ষিত হতে হবে- মেয়েকেও, মেয়ের মা বাবাকেও।

মামানির কাছে শোনার পর মায়েরও উৎসাহ জেগে ওঠে। আমাকে খুলে কিছু বলেন না। শুধু বলেন, তোর বিয়ের একটা ভালো প্রস্তাব এসেছে। মায়ের কথা শুনে, আমি তখনই তাঁকে জানিয়ে দিই যে, আমি এখন বিয়েটিয়ে করতে পারবো না, সামনে পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে পাস করি, তারপর ওসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবো।

আমার কথা শুনে মা তখনকার মতো চুপ করে যান। কিন্তু তাঁর মুখে আমি হাসি দেখতে পাই। ওদিকে মামানি আমাকে বোঝাতে আরম্ভ করেন। বলেন, এম এ পাস করলে কী হবে তোর? মাথায় নতুন শিং গজাবে? বয়স হয়নি তোর? পঁচিশ হতে কি দেরি আছে, বল? তোর বয়সে আমার দুটো বাচ্চাই হয়ে গেছে, ওসব বাদ দে, যাদের কথা তুই ভাবিস, ওদের কোনো মুরোদ নেই, বুঝলি?

মামানিও খুলে কিছু বললেন না, শুধু কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করলেন অনেক রাত পর্যন্ত। আর তাই তোমার সঙ্গে দেখা হলে খবরটা জানাবার জন্য বিকেলে আসতে বলেছিলাম। তখন খবরটা বলিনি এই জন্য যে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছো, মাঝখানে এই রকম খবর শুনে যদি মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা ঢুকে যায়? তখন তো মুখ দিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বেরিয়ে যেতে পারে। তাই গতকাল সকালে কিছু বলিনি- ভেবেছিলাম বিকেলে বলবো। তুমি ইন্টারভিউ দিয়ে এলে, তখন বলবো। কিন্তু বিকেলে তো আসতেই দিলেন না মা।

তা বিকেলে তো বোধহয় ওরা এসেছিলো? ছিলোও তো প্রায় সাড়ে আটটা-নয়টা পর্যন্ত, তাই না?

হ্যাঁ, তুমি কেমন করে জানলে? সীমা অবাক হয়। বলে, তোমাকে কি কেউ জানিয়েছে?

না, সাজিদ মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে, তোমার দেখা না পেয়ে আমি বাড়ি ফেরার পথে কাল ওদিকে গিয়েছিলাম, কলোনির মাঠে আমতলায় দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ, দেখেছি তিনতলার ফ্ল্যাটে সব ঘরে বাতি জ্বলছে, তোমার মামাকে দেখলাম, মামানিকে দেখলাম, তোমার মাও একবার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তোমাকে একবারও দেখিনি।

আমি কীভাবে উঠে আসবো। সীমা জানায়, পাত্রপক্ষের লোকদের সামনে আমাকে তো বসিয়ে রাখা হয়েছিলো।

একটু থেমে আবার বলে, তুমি যখন গিয়েই ছিলে তখন তিনতলায় গেলে না কেন? তুমি যদি দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে চলে যেতে, তাহলে আমি বলে দিতাম সবার সামনে যে, তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, তাহলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যেতো। ওরা আর এগুতে চাইতো না।

পাত্র নিজে কি এসেছিলো? সাজিদ শান্তভাবে জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ , সারাক্ষণ সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিলো। মাঝারি হাইট, বেশ সোটা মোটা ভারিক্কি চেহারা। মিষ্টির প্যাকেট দু'হাতে ঝুলিয়ে যখন ভেতরে আসে, তখন মনে হয়েছিলো, বোধহয় পাত্রের গার্জেন। পরে সারাক্ষণ সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিলো। মামার বন্ধু আনসার সাহেবের ওয়াইফ যখন বললেন, ভাই আপনি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করুন। তখন বুঝলাম উনি গার্জেন নন, নিজেই পাত্র।

একটুপর মামা আর তাঁর বন্ধু চলে গেলেন বারান্দায়, এদিকে মামানি আর মিসেস আনসার গিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে। আমিও উঠছিলাম, তো মা বাধা দিলেন। বললেন, তুই কেন উঠছিস? কিছুক্ষণ বোস, দুজনে কথা বল। আলাপ করার জন্যই তো ওঁরা এসেছেন। এই কথা বলে মাও চলে গেলেন।

তখন বুঝলাম গোটা ব্যাপারটাই প্ল্যান করে সাজানো। পাত্র ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করতে চান। তো লোকটা জানতে চাইলো আমি কী পড়ছি, সাবজেক্ট কী আমার।

রিসার্চ করার ইচ্ছে আছে কি না, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী, হাউজ-ওয়াইফ না কি ক্যারিয়ার বানানো কোন কাজ পছন্দ, টিচিং ? নাকি রিসার্চ? নাকি অফিস এক্সিকিউটিভ?

আমি বললাম, ওসব ভাবিনি, আগে মাস্টার্স ডিগ্রি হোক, তারপর ওসব নিয়ে ভাববো।

তখন বললো, জীবনে লক্ষ্য থাকা দরকার, লক্ষ্য না থাকলে জীবনে কিছুই করা যায় না।

ঐ রকম উপদেশ শুনে গা জ্বলে ওঠে আমার। আমি জিজ্ঞেস করি, আপনার জীবনের লক্ষ্য বলে কিছু কি ছিলো? যদি ছিলো, তাহলে এতোদিন বিয়ে করেননি কেন? এতোদিন যখন করেননি, তাতে বোঝা যায়- বিয়ে করাটা আপনার জীবনের লক্ষ্য ছিলো না, তা বিয়ে করার শখ কেন চাগিয়ে উঠলো আপনার হঠাৎ? এই বয়সে?

লোকটাকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য ঐভাবে কথা বলেছিলাম আমি- ভেবেছিলাম মুখোমুখি ঐভাবে কথা বললে, সে আমাকে বেয়াদপ বদরাগী ভেবে অপছন্দ করবে। কিন্তু দেখলাম লোকটা চটলো না। বরং মিটি মিটি হাসতে লাগলো। বললো, ঠিকই ধরেছেন। আসলে বিয়ে করাটা জীবনের লক্ষ্য কোনো সময়ই ছিলো না, কিছুদিন হলো খুব বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করছি, তাই এখন-

কথা শেষ করে না। দাঁত কেলিয়ে থাকে। তখন জিজ্ঞেস করলাম ওদেশে কি মেয়েমানুষ নেই যে ঢাকার এসেছেন?

আমি তো বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, ফের দাঁত কেলিয়ে হাসে লোকটা। তখন জিজ্ঞেস করলাম, ওদেশে বাঙালি মেয়ে নেই? আমি তো জানি, ওদেশে, মানে ইস্ট লন্ডনে অনেক বাঙালি বাস করে। তারপর বার্মিংহাম-এ আছে, এডিনবরায় আছে। ওসব বাঙালি পরিবারে কি মেয়ে নেই?

আমার কথা শুনে লোকটা ফের হাসে। আর চোখে চোখে এমনভাবে তাকায় যে গা জ্বলে ওঠে আমার। লোকটা বলে, ওখানে নাকি পছন্দ মতো মেয়ে পায়নি, তাই দেশে এসেছে বউ খুঁজতে। ওর ঐ কথা শুনে আমি আর রাখঢাক করি না, মুখের ওপর বলে দিই, আসলে বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে ওখানে কোনো মেয়ে আপনাকে পছন্দ করেনি, তাই দেশে এসেছেন কোরবানির ছাগল গরুর মতো মেয়ে কিনতে, তাই না ?

না না না, লোকটা প্রতিবাদ করে আবার হাসেও। বলে, এটা আপনার ভুল ধারণা। বিদেশে থাকলে কী হবে, আমরা দেশকে ভালোবাসি, তাই দেশের লোকের সঙ্গেই আত্মীয়তা করতে বেশি পছন্দ করি, দেশ থেকেই লাইফ পার্টনার নিয়ে যেতে চাই, সেই জন্য আসা।

ঐ কথার পর আমি শেষ কথা বলি, দেখুন খোঁজ করে লাইফ পার্টনার পান কি না। আমার মনে হয়, পাবেন, তবে আমার নিজের কথা বলতে পারি এইটুকু যে, বিদেশে যাওয়ার বা বিদেশে থাকার কোনো আগ্রহ আমার

নেই, অন্তত এখন পর্যন্ত হয়নি।

আমি লোকটার সঙ্গে ইচ্ছে করেই অমন খারাপ ব্যবহার করেছি, যাতে আমাকে পছন্দ না করে, বুঝেছো? এখন যে কী হবে বুঝতে পারছি না।

ঘটনার পুরো বয়ান শুনিয়ে সীমা মুখোমুখি তাকায়। তারপর বলে, আমার চিন্তা হচ্ছে সাজু, আমার ঐ কথার পরও যদি লোকটা আমাকে পছন্দ করে ফেলে, তাহলে মামা আর মামানি তো তার ঘাড়ে আমাকে চাপাতে চেষ্টা করবেনই। এমন কি মা-ওদের কথায় সায় দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেতে চাইবেন। তুমি একটা কিছু করো।

সাজিদ সব শুনে চুপ করে থাকে। কী করবে সে? কীভাবে বাধা দেবে? একটাই মাত্র উপায় আর তা হলো, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় নিজেরা বিয়ে করে নেওয়া। কিন্তু তাতে তো বহু রকমের ঝামেলা হবে। সীমাদের বাসায় যেমন, তেমনি তার নিজের বাড়িতেও। মা তো ভীষণ ক্ষেপে যাবেন। এমনিতে সংসার চলে না, তার ওপর ঘরে একজন বাড়তি মানুষের বোঝা চাপবে- আর বিয়ের খরচ নেই? কাজীকে টাকা দিতে হবে না? দলিল করার জন্য স্ট্যাম্প কিনতে লাগবে না? রেজিস্ট্রেশন ফি নেই? আর সবই তো করতে হবে লুকিয়ে? লুকিয়ে লুকিয়ে এসব করা কি কম ঝামেলার?

কী হলো? সীমা সাজিদের ঘাড়ে ঠেলা দেয়। বলে, কী ভাবছো? কিছু বলো?

আমি তো বুঝতে পারছি না কী করা যায়। খালি একটা পথই দেখতে পাচ্ছি, তাহলো দুজনে কাজীর অফিসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলা।

আরে নাহ্, সীমা এক কথায় বাতিল করে দেয় প্রস্তাবটা। বলে, এভাবে লুকিয়ে আমি বিয়ে করতে পারবো না। ওভাবে বিয়ে করলে আমার মা খুব কষ্ট পাবেন, আর এখন, এই বিলেতী পাত্রের প্রস্তাব আসার পর যদি আমরা ঐভাবে কাজটা করি, তাহলে, মাকে মামানি বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। খবরদার না, ঐ পথে এখন অন্তত যাওয়া চলবে না।

সীমা খুব জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ায়।

তারপর কিছুক্ষণ থেমে কিছু যেন ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা লোকটাকে ভড়কে দেয়া যায় না? এমন ভাবে ভড়কাতে হবে যাতে ও নিজেই আর এদিকে পথ কখনো মাড়াতে না চায়, এমন কথা বলা হবে যে মামার বন্ধু আনসার সাহেবও কিছু বলার আগ্রহ কখনো বোধ করবেন না।

কিন্তু বলবেটা কী, সেটা বলো? সাজিদ জানতে চায়।

আমার সম্বন্ধে খুব খারাপ কথা বলতে হবে। সীমা জানায়। বলে, শোনাতে হবে যে আমি খারাপ, যে আমার স্বামী আমাকে বিয়ের দুদিন পরই ডিভোর্স করেছে। কারণ আমার স্বভাব খারাপ, গুরুজনদের রেসপেক্ট করতে জানি না, স্বামীকে খুব জ্বালাই, দুশ্চরিত্র- অনেক ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো, এখনও আছে। এইসব খবর লোকটার কানে তুলতে হবে।

সাজিদের হাসি পায় সীমার মুখে ঐরকম ছেলেমানুষি প্ল্যান শুনে। বলে, তুমি সবাইকে তোমার মতো ছেলেমানুষ ভাবে কেন? ওরা কি খোঁজ খবর না নিয়ে এসেছে? কোনো রকম সন্দেহ মনে জাগলে খোঁজখবর কি নেবে না? তুমি একটা গপ্পো বানিয়ে শোনাবে আর সেটা ওরা বিশ্বাস করবে? ওরা তো একটা ডেফিনিট উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে- অমন একটা বানানো গপ্পো শুনেই ভড়কে যাবে? খোঁজ খবর করবে না? সত্যি মিথ্যে যাচাই করবে না। আমাদের কথা শুনে তোমার মামাকে যখন চেপে ধরবে তখন তিনি কী করবেন? সত্যি কথাটা বলবেন না?

বেশ তো খোঁজ নিক। আমরা তো মিছে কিছু বলবো না, যা আসলেই ঘটে গেছে তাই জানাবো। তাছাড়া আমরা তো আসলে সময় চাইছি। এজন্য চাইছি, যাতে ওরা বিয়ে করার জন্য মামা মামানির ঘাড়ের ওপর চেপে না বসে। হাতে যদি আমরা কিছু সময় পাই তাহলে নিশ্চয়ই একটা পথ খুঁজে বের করা যাবে। তুমি তোমার মা বাবাকে যদি বুঝিয়ে রাজি করাতে পারো, তাহলেই তো সমস্যা মিটে গেলো। আর এদিকে যদি আমি মামা মামানিকে না পারি শুধু মাকে রাজি করাতে পারি, তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগার মতো একটা ব্যাপার হয়ে যাবে।

সাজিদ নিজের মনে সায় পায় না। কারণ নিজের মাকে সে ভালোরকম চেনে। একবার না বললে তাঁর মুখ দিয়ে 'হ্যাঁ' বলানো খুবই কঠিন। সে বোঝে, একটা চাকরিই হচ্ছে সব সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আসল চাবিকাঠি। সে মনে মনে ঠিক করে, গাজীপুর সে আবার যাবে, গিয়ে ওখানকার ডিসি সাহেবের হাতে পায়ে ধরে চাকরিটা চাইবে। হয়তো নিরাশ হতে হবে, তবু চাকরিটা চাইবে। আর গতকাল আমিন যা বলেছে, সেই কথা মতো আজই সে দেখা করবে ওর সঙ্গে, কলেজেই হোক বা খবরের কাগজেই হোক, একটা চাকরি পেয়ে গেলেই সে সব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে।

পাশে বসা সীমার মুখের দিকে তাকায় সে। আসলেই যে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছে ও, তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। সে বলে, অতো চিন্তা করো কেন? যা হবে, তাই আমাদের ফেস করতে হবে- তোমার মন যা চাইবে, তাই করবে। তাতে যা হবার হবে- মনে জোর আনো। দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়লে, আরো ঝামেলা বাড়বে।

দেখতে দেখতে ঘন্টা পার হয়ে যায়। সাজিদ উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমাকে এখন কোচিং-এ যেতে হবে- চিন্তা করে লাভ নেই- তুমিও জানো আমিও জানি, তোমার মামা-মামানির প্ল্যান সাকসেসফুল হতে আমরা দেবো না। তুমি ওদের মুখোমুখি হও, আমি এদিকে প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি, একটা চাকরি জোটানো যায় কি না।

সীমা তার হাত চেপে ধরে। বলে, আমার কথা নিয়েই তো পুরোটা সময় কেটে গেলো, তোমার ইন্টারভিউর কী হয়েছে তাতো বললে না।

সে সাজিদকে আবার টেনে পাশে বসায়।

সাজিদ মাথা নাড়ায়। বলে, ওখানে কিছু হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত, আমি ওভার কোয়ালিফায়েড, ওদের সন্দেহ, ভালো চান্স পেলেই আমি পালাবো। আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, ওখানে বোধহয় চাঁদাবাজি চলে- ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে বলাবলি হতে শুনলাম, কিছুদিন আগে নাকি একজন কমার্সের, মানে এ্যাকাউন্টিংয়ের টিচার নিয়েছে তাতে যে সিলেকটেড হয়েছে তার কাছ থেকে কলেজ অথরিটি দু'লাখ টাকা ডোনেশন নিয়েছে।

ওমা, সে কি! সীমা আকাশ থেকে পড়ে। বলে, এসব তুমি কী বলছো?

ঠিকই বলছি, সাজিদ জানায়। বলে, এই চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারটা এখন খুবই চালু।

তোমার কাছে কি ডোনেশন চেয়েছে?

না, তা চায়নি। তবে শুনলাম ওটা বাঁধাধরা নিয়ম হয়ে গেছে ওখানে। শুধু ওখানেই নয়, সারা বাংলাদেশেই এখন এইরকম ডোনেশন দিয়ে তারপর প্রাইভেট স্কুল কলেজে চাকরি নিতে হয়, এটাই এখন নাকি নিয়ম।

কিন্তু কতো? জিজ্ঞেস করানি?

না, জিজ্ঞেস করতে হয় না, কান খোলা রাখলে আপনা থেকেই খবর কানে চলে আসে- এক ফাঁকে এসে গেলো আমার কানেও। শুনলাম, একজন আর একজনকে বলছে, সে না কি দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার জন্য তৈরি- আর তার সঙ্গীটিকে বলতে শুনলাম, ওটা বাড়িয়ে দু'লাখ টাকা না করলে চাকরি হবার চান্স নেই।

তাহলে? সীমার চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব ফোটে। বলে, তুমি অতো টাকা কোথায় পাবে?

সাজিদ মাথা ঝাঁকায়। বলে, শোনোই না, কী হলো তারপর- ওখানকার যিনি ডিসি, মানে জেলা প্রশাসক, সেই ভদ্রলোক মনে হলো বেশ কালচার্ড মানুষ। একসময় নাকি রাজশাহীতে নাটকের দল করতেন- তিনি বললেন, ওখানে চাকরি নিলে বন্ড দিতে হবে, যে দুবছর পর্যন্ত ঐ কলেজেই চাকরি করতে হবে, অন্য কলেজে যাওয়া চলবে না।

তো ঐ ডিসি ভদ্রলোক থাকতে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েনি অন্য ক্যান্ডিডেটরা। এখন দেখা যাক, পরশুদিন একবার খোঁজ নিতে যাবো ভাবছি।

পরশু দিন কখন? কতোক্ষণ লাগবে ফিরতে? সীমা জানতে চায়।

কেন? তুমি যেতে চাও? সাজিদ সীমার মুখোমুখি তাকায়।

দেখি, সময় পাই কি না, বহুদিন বাইরে কোথাও যাওয়া হয় না- খুব দেরি হবে না তো?

আরে নাহ্, ঐ কলেজের টিচারদের সঙ্গে একটু কথা বলবো, আর ডিসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো। ভদ্রলোক আমার চিঠিতে যে ইংরেজি কাগজে আমার আর্টিকেল ছাপা হওয়ার উল্লেখ ছিলো তা দেখেছেন। আর ও নিয়ে প্রশ্নও

করেছেন ইন্টারভিউর সময়।

বাহ্ তাহলে তো ভালোই, সীমা খুশি হয়ে বলে, তাহলে তো মনে হয় চাকরি হওয়ার ভালো চান্স আছে। আমি যাবো বুঝলে, তোমার সঙ্গে যাবো, যাওয়ার আগের দিন আমাকে জানাবে, ভুলবে না কিন্তু।

কথা কটা বলেই সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে, আর না আমার ক্লাস আরম্ভ হবে এক্ষুণি, আমি যাই, আর হ্যাঁ-

শেষ কথা বলার জন্য মুখোমুখি তাকায়। আর বলে, শোনো ঐ বিলেতী বুড়ো ষাঁড়টাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বেশি বাড়াবাড়ি যেন না করে- করলে ওর খবর আছে!

রাবেয়া খাতুন গত তিন চারদিন ধরে কেমন যেন চুপ হয়ে গিয়েছেন। কথা বার্তা একেবারে যে বলেন না তা নয়। বলেন, তবে খুবই কম? সংক্ষেপে শুধু প্রশ্নের জবাব দেন, তাও খুবই অল্প কথায়। বারবার করে মেয়ের মুখের দিকে তাকান আর ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। পাত্রটিকে তিনি সামনা সামনি দেখেছেন। বয়স যথেষ্ট বেশি। পুরো পঞ্চাশ না হলেও তার কাছাকাছি তো বটেই। বয়সের কথা মনে হলে একটা আপত্তি অবশ্যই অনুভব করেন। কিন্তু মেয়ের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির কথা যখন চিন্তা করেন তখন মনের মধ্যে সেই আপত্তির কোনো রেশই আর থাকে না। তাঁর বেশি চিন্তা হয় নিজেকে নিয়ে, মেয়ে যদি দেশেই কোথাও থাকতো তাহলে চিন্তার কারণ ছিলো না। মেয়ে সেই দূর বিদেশে চলে গেলে তাঁর কাছে কে থাকবে? মানে কার কাছে থাকবেন তিনি? স্কুলের চাকরি আছে, মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, তাই বড় ভাইয়ের কাছে আছেন। তাছাড়া বড়ভাইয়ের ছেলের চাকরি নেভিতে, চিটাগাং থাকে- মেয়ে থাকে সিলেটে, জামাই ব্যাংকে চাকরি করে তাই কখনো কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু পরে কী হবে? বড় ভাই রিটায়ার করার পর সরকারি বাড়িতে থাকার মেয়াদ বলে কয়ে কিছুদিন বাড়িয়ে নিয়েছেন, সেই মেয়াদও ফুরিয়ে এলো বলে।

তখন উঠে যাবেন নিজের বাড়ি উত্তরায়। তখন তিনি কী করবেন? তাঁর চাকরির মেয়াদ তো আরও কিছুদিন আছে। বড়ভাইয়ের সঙ্গে উত্তরায় চলে গেলে, সেই উত্তরা থেকে আজিমপুরের স্কুলে তিনি চাকরি করতে আসবেন? রোজ? সেটা কি সম্ভব?

যদি আলাদা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন, তখনই বা কে থাকবে তাঁর সঙ্গে? মেয়েতো সংসার করতে চলে যাবে লন্ডনে! নাকি আরলিয়ার রিটায়ারমেন্ট নেবেন, নিয়ে চলে যাবেন রংপুর শহরে, স্বামীর ভিটায়, নিজেদের বাড়িতে, যে বাড়ি ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। সেখানে গিয়ে কি থাকবেন? না, আর কেউ সঙ্গে থাকবে না। কাজের মেয়ে একটি থাকতে পারে কিন্তু নিজের লোক কেউ থাকবে না। নিজের লোক কোথায় পাবেন? নিজের লোক মানে যাকে বিশ্বাস করা যায়। মন খারাপ হলে যার সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা বলা যায়। এমন কোনো লোক কি পাওয়া যাবে? তাঁর আপন লোক বলতে তো ঐ পেটের মেয়ে সীমা। ওরই কাছে তো সুখ দুঃখের কথা বলেন। তখন মন খারাপ হলে যে মেয়েকে কাছে ডাকবেন কি নিজেই চলে যাবেন মেয়ের কাছে তারও তো কোনো উপায় থাকবে না। ঢাকা থেকে লন্ডন বা ওখান থেকে এখানে আসা বা যাওয়া কি সোজা কথা? তাহলে? কোথায় থাকবেন তিনি? তাহলে কি লন্ডন প্রবাসী পাত্রের প্রস্তাব বাতিল করে দেবেন? কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? অমন পাত্রকে হাতছাড়াই বা কেমন করে করেন। পাত্রের বয়স বেশি একটা আপত্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু ওরা যদি মেয়ের জীবনের পুরনো ঘটনার কথা তোলেন? সোজা কথা? তাহলে? কোথায় থাকবেন তিনি? আবার এদিকে এমন পাত্র হাত ছাড়াই বা কেমন করে হতে দেন?

মেয়ের জীবনে একটা ঘটনা আছে। সেটাকে তিনি পাত্তা দিতে চাইতেন না। ভাবতেন, বাপের বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে যাবার আগেই যে বিয়ে তালাক হয়ে যায়। সে বিয়ে কি বিয়ে?

ভাবতেন, তার মেয়ের বিয়েটিয়ে হয়নি। কিন্তু মেয়ের বাপ, তার স্বামী শাহেদ হাসান মেয়ের বিয়ের জন্য মনে মনে পাত্র খুঁজতেন। বুঝতেন তালাক হওয়া মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে অনেক টাকা- পয়সা লাগবে। তাই টাকাও জমাতে শুরু করেছিলেন মেয়ের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে। কিন্তু হলে কী হবে, মনে যে আঘাত পেয়েছিলেন, তা সামলে ওঠা কি সবার পক্ষে সম্ভব? তার পক্ষে সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাই তাকে চলে যেতে হয়। সম্ভবত ওটাই কারণ। মেয়ের বিয়ে আর তালাকের ঘটনাটাই তার হার্ট অ্যাটাকের ঘটনাটা ঘটায়।

তার খালাতো বোনের ছেলে সালেক হোসেন ঢাকায় ল' পড়তো। তখন ফাইনাল ইয়ার। শহর থেকে তাদের গ্রাম বেশি দূর না। তাই ঢাকা যাওয়া-আসার পথে রংপুরে মামার বাড়িতে দু'চারদিন কাটিয়ে যেতো। সীমা তখন সদ্য কলেজে উঠেছে। ফুফুতো-মামাতো ভাইবোনে হাসাহাসি গল্পসল্প করতে দেখা যেত। ঐ সময় সালেকের মা খালাতো ভাইয়ের কাছে প্রস্তাবটা করেন। শাহেদ হাসান সঙ্গে সঙ্গে রাজি না হলেও আপত্তির কারণ খুঁজে পাননি। কারণ তার সন্তান বলতে ঐ মেয়েটিই, তাকে তো ধরে রাখতে পারবেন না, বিয়ে দিতেই হবে। সে অবস্থায় আত্মীয়-স্বজন বা চেনাজানা পরিবারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হওয়াই তো ভালো– সেই হিসেবে সালেকের সঙ্গে সীমার বিয়ে হলে মন্দ কি? বরং অমন পাত্রই ওর জন্য ঠিক হবে। ছেলে ল' পাস করে রংপুরের জজকোর্টে প্র্যাকটিস করবে। আর মেয়ে কলেজের পড়া শেষ করে মায়ের মতোই স্কুলে চাকরি নেবে নয়তো স্রেফ সংসার করবে। সবই রংপুরে, রাধাবল্লভে, বাপের বাড়িতে। রাবেয়াও স্বামীর চিন্তার মধ্যে ভুল কিছু দেখেননি।

কিন্তু দেখা গেলো মেয়ে রাজি নয়। মাত্র ১৭/১৮ বছর বয়স। কিন্তু তার ভীষণ আপত্তি। আপত্তির কথা সে মা বাবাকে জানায়। কিন্তু যখন দেখে যে তার আপত্তিকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না, তখন সে মন খারাপ করে ঘরের বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতো আর কাঁদতো। তখন সে গল্প করে না, বান্ধবীর বাড়িতে যায় না, কলেজেও কোনো দিন যায়, কোনো দিন যায় না। তার মুখে এক কথা, সে এখন বিয়ে করবে না। তার লেখাপড়া শেষ হোক, তারপর সে বিয়ের কথা ভাববে।

তাকে যতোই বোঝানো হয় যে, বিয়ের পরও মেয়েরা ইচ্ছে করলে লেখাপড়া করতে পারে। রংপুরেরই তো মেয়ে বেগম রোকেয়া, কই বিয়ে হওয়ার পর কি তার লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিলো? আসলে ইচ্ছেটাই বড় কথা। ইচ্ছে থাকলে আর চেষ্টা থাকলে বিয়ের আগে যেমন লেখাপড়া করা যায়, বিয়ের পরেও তেমনই লেখাপড়া করা যায়। সংসারের যদি দায়িত্ব থাকে, তাহলে কিছু অসুবিধা হতে পারে তবে তাতে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় না।

ব্যাপারটা মেয়েকে কেউই বোঝাতে পারেনি। তিনি নিজেও না। সে কারও কথাই শুনতে চায় না। শেষে শাহেদ হাসানের ধৈর্যের বাঁধ আর থাকে না। মেয়ের মত নেই জেনেও বিয়ের আয়োজন শুরু করে দেন। বলেন, আপত্তিটা আসলে মেয়ের ছেলেমানুষি জেদ, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে– আর বিয়ের কথা শুনলেই তো মেয়েরা কাঁদে, কাঁদে না? বলো? বিয়ের জন্য যা যা দরকার সব কিছুই করতে থাকেন তিনি। এদিকে মেয়েরও মরণপণ জেদ, বিয়েতে সে কিছুতেই রাজি হবে না। বিয়ের দিন সকালবেলা সেই যে ঘরের দরজা বন্ধ করে, তারপর আর কিছুতেই খোলে না। ওদিকে বরযাত্রী এসে গেছে। তখন মেয়ের মা বন্ধ দরজায় মাথা কুটে কুটে সেটা খোলান। মেয়ে বিয়ের সাজ পরবে না, বেনারসী গায়েই তুলতে দেবে না। একখানা সাদা সুতির শাড়ি পরানো হলো, না কোনো গয়না নয়। যা সব সময় থাকে, তাই থাকবে। তবু ওরই মধ্যে বিয়ে হয়। কাবিনের সময় মৌখিক সম্মতি মেয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, নাকি অন্য কেউ 'এজেন' দেয়– তা কাজী সাহেব খুঁটিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

বিয়ের অনুষ্ঠান ঐভাবেই হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে শাহেদ হাসান অন্দর মহলের খবর নিতে পারেননি। পরে শুনলেন রাত বেশি হয়ে যাওয়াতে মেয়েকে বিদায় করে নিয়ে যেতে পাত্রপক্ষ রাজি নয়। পরের দিন সকালে তারা বিদায় নেবেন। তবে বরযাত্রীরা রাতেই রওনা হচ্ছেন, কেউ কেউ রওনা হয়েও গেছেন। রইলেন শুধু পাত্র। পাত্রের মা আর দু'জন বয়স্কা আত্মীয়া মহিলা। মেয়ে জামাইকে বাকি রাতটুকু একত্রে কাটাবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে মেয়ের উত্তেজিত গলার আওয়াজও বেশ কয়েকবার শোনা যায়। কিছুক্ষণ পর আর কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, যাক তাহলে ভালোয় ভালোয় কাজটা শেষ হলো।

কিন্তু মাঝরাতে ঘরের ভেতর থেকে আবার চিৎকার শোনা যায়। আর তারপরই দেখা যায় সীমা দরজা খুলে ছুটে বেরুতে গিয়ে বারান্দায় আছড়ে

পড়েছে। মেয়েকে তোলা হলে সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা এ বিয়ে আমি মানি না। ও কেন আমার গায়ে হাত দেবে? আব্বা, আপনার ঐ ভাগ্নে জোচ্চোর ও আপনার বাড়িঘর, টাকা-পয়সা, সহায়সম্পত্তির লোভে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছে। আমাকে বলে, নাও তোমার আব্বাকে বলো, তার সব সম্পত্তি যেন আমাদের দু'জনের নামে লিখে দেন। তাহলে আমাকে নাকি অনেক বেশি ভালোবাসবে, টাকা রোজগারের জন্য বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে না, তাই আমার কাছে সর্বক্ষণ থাকবে। কি বিশ্রী কথা বলে- লোভী, শয়তান, জানোয়ার, ছোট লোক। না মা, আমি এ বিয়ে মানি না- কোনোদিন মানতে পারবো না। যদি তোমরা আমাকে ওদের বাড়িতে জোর করে পাঠাও, তাহলে বলে রাখছি, ওদের বাড়িতে গিয়েই আমি সুইসাইড করবো।

থ হয়ে যায় সবাই মেয়ের কথা শুনে। মা-বাবা দু'জনেই মেয়েকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মেয়ে শান্ত না হয়ে পাগলের মতো হয়ে ওঠে– তার পাগলামি রাতভর চলে, পরের দিনও থামে না। শেষে ডাক্তার ডাকা হয়। ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু লাভ হয় না। মেয়ে ঘন্টাখানেকও ঘুমোয় কি না সন্দেহ। ডাক্তার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বিয়ের যোগ্য মেয়েকে মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত রাখার পরামর্শ দিয়ে চলে যান। অবশেষ তালাকের কথা তোলা হয়। কিন্তু পাত্রপক্ষ কেন রাজি হবে? তারা তো কোনো অন্যায় করেনি? তাছাড়া তাদের মানসম্মান নেই? বিয়ের আয়োজন করতে কি তাদের টাকা-পয়সা লাগেনি?

অগত্যা টাকা-পয়সা দিয়ে ফয়সালা করতে হয়– একেবারে কম নয় আংকটা। পুরো এক লাখ। বিয়ের আয়োজন, বরযাত্রী নিয়ে আসা ইত্যাদির খরচ পঞ্চাশ হাজার। আর তালাকের জন্য পঞ্চাশ হাজার। সরকারি স্কুলের একজন মাস্টার কতো আর রোজগার করতে পারে। যতোই সে প্রাইভেট ট্যুইশানি করুক।

মনে বড় আঘাত পেয়েছিলেন মুর্শেদ হাসান মাস্টার। রাবেয়া খাতুন স্বামীর কথা স্মরণ করেন আর দু'হাতের ওপর মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদেন। মেয়ের বিয়ে-তালাকের ঘটনার কয়েকদিন পরই ব্রেইন স্ট্রোক হয় তার। তারপর প্যারালাইসিস। শেষে অন্তিম যাত্রা। মেয়ের ঐ বিয়ে তালাকের ঘটনার পর ছয় মাসও পার হয়েছিলো কি না সন্দেহ।

এদিকে বাবা তো গেলো, এখন মেয়েকে কে সামলায়? মেয়ের ধারণা, তার কারণেই বাপের অমন মরণ। মেয়ে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। মেয়েকে বাড়িতে রেখে রাবেয়া স্কুলে যেতে পারেন না। খুবই খারাপ দিন সেসব রাবেয়া খাতুনের জীবনে।

ক্রমে স্বাভাবিক হতে থাকে অবস্থা। সেও অনেক পরে। সব মিলিয়ে প্রায় বছরখানেক সময় পার হয়ে যায়। হাশিম ডাক্তার সাহেবের হোমিওপ্যাথি ওষুধের গুণে, নাকি তার সঙ্গে রোজ সকালবেলা মর্নিং ওয়াকের গুণে বলা মুশকিল। দেখা যায়, মেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। দিব্যি গল্প করতে দেখা যায়। বই পড়ে। কলেজের বান্ধবীরা এলে ওদের সঙ্গে আড্ডাও চলে। শেষে মেয়ে কলেজে যাওয়া শুরু করে দেয়। প্রায় এক বছর সে পিছিয়ে। কিন্তু তবু দমে না সে। তিন বছরের অনার্স কোর্স, দু'বছর তো সে হাতে পাচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারলে ঐ দু'বছরই যথেষ্ট বলে তার ধারণা। আর সেই ধারণা অনুযায়ীই ক্লাস করতো, টিউটোরিয়াল দুই-ই। স্যারেরা তার পড়াশোনার আগ্রহ দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান।

কিন্তু খুবই অল্প ক'দিন মাত্র। পুরুষ লিঙ্গের প্রভুত্বই যে সমাজের সাধারণ রীতি সে সমাজে সালেক কীভাবে সীমার কথা ভুলবে? ও তখন ল' পাস করে জেলা কোর্টে ওকালতিতে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু কোর্ট এলাকায় ওকে পাওয়া যায় না। ওকে পাওয়া যায় কলেজ গেটের সামনে। সীমা রিকশা থেকে নামলেই সে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়। তারপর আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। কোনোদিন বলে, তুমি তো আমাকে ভালোবাসতে তাই না? বলো? তাহলে কেন আমাকে তোমার জীবনের বাইরে ঠেলে দিচ্ছো? আমি কি দোষ করেছি? আমি তোমাকে নিয়ে এক বিছানায় শুইনি, সেই জন্য আমাকে তুমি ত্যাগ করেছো, তাই না?

অমন অশ্লীল কথা, কিন্তু অদূরে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। সবাই মজা দেখে আর হাসে, কেউ প্রতিবাদ করে না। কারণ তাদের আগেই জানানো হয়েছে যে, দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। অল্প ক'দিন হলো বিয়ে হয়েছে আর এরই মধ্যে ঝগড়া করে দু'জনে আলাদা হয়ে গেছে। এখন ঐ বাচ্চা উকিল বউয়ের মান ভাঙাবার জন্য রোজ চেষ্টা করে।

সীমা কিছুই করতে পারে না, প্রথমে অগ্রাহ্য করতো, তারপর চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতো। প্রিন্সিপালের কাছে নালিশও জানিয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সবার কাছে সালেক মোহাম্মদের ঐ একই কৈফিয়ত। বলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে তা দূর করতে হবে না? বলুন স্যার, আপনিই বলুন, দু'জনের ভুল বোঝাবুঝি যদি দূর করতে হয়, আবার মিলমিশ যদি করতে হয়, তাহলে দু'জনে কথা বলা ছাড়া আর কি কোনো পথ আছে স্যার, বলুন?

সীমা ওদিকে চিৎকার করে, গালাগাল করে, বিয়ের দিনই কীভাবে তালাক দেওয়া হয়েছে, সেসব কথাও বলে যায়। কিন্তু লোকজন শুনে যেন মজা পায়, দু'একজন অবশ্যি বিরক্ত হয়ে সালেক মোহাম্মদ উকিলকে বকাবকি করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা এতো কম যে, সালেক মোহাম্মদ তাদের গ্রাহ্যই করে না। শেষে সীমা কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বন্ধ না করে কী করবে। কানের কাছে ন্যাকামি আর হ্যাংলামি ভরা কথা বলতে দেবে? কাকুতি-মিনতি করবে আর হাত জোড় করে বলবে, প্লিজ মাফ করে দাও, তোমার পায়ে পড়ি। আর আমি তোমাকে কিছু বলবো না। তুমি যা বলবে তাই করবো- এসো অতীতকে ভুলে যাই, আবার নতুন করে জীবন শুরু করি।

রোজ এই রকম ন্যাকামি আর হ্যাংলামি, প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করেও কোনো লাভ হয় না। তিনি বলেন, ও তো দুষ্টুমি করে ক্যাম্পাসের সীমানার বাইরে। ভেতরে হলে অ্যাকশন নিতে পারতাম, আর ও তো ছাত্র নয়- তুমি থানায় কমপ্লেন দিয়ে এসো।

অমন অবস্থায় কী করতে পারে সে? কলেজে যাওয়া শুধু নয়, বাইরে বেরুনোও বন্ধ করে দেয়।

রাবেয়া কী যে করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। শেষে ঢাকায় বড় ভাই মাহতাব হোসেনের কাছে চিঠি লিখে নিজের অবস্থার কথা সবই জানান। তিনি তখন সেকশন অফিসার থেকে প্রমোশন পেয়ে ডেপুটি সেক্রেটারির চেয়ারে বসছেন। বোনের চিঠির শেষ লাইনটি তাকে খুবই বিচলিত করে দেয়। বিধবা বোন মেয়েকে নিয়ে অমন ঝামেলায় পড়েছে। তার জন্য কিছু করা অবশ্যই জরুরি। প্রথমে ভাবেন রংপুরের ডিসিকে টেলিফোনে অনুরোধ করবেন, যাতে সালেক মোহাম্মদকে আচ্ছামতো শিক্ষা দিয়ে দেয়। কিন্তু পরে মত বদলান। কারণ তার ভাগ্নির বদনাম তাতে আরো বাড়বে। শেষে বোনকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে তার বদলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে যেন মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে।

এক মাসের মধ্যে রংপুর গার্লস হাইস্কুলের টিচার ঢাকায় আজিমপুর গার্লস স্কুলে বদলি হয়ে আসেন।

ভাইয়ের তদবিরে বদলি হয়ে তো এলেন, কিন্তু থাকবেন কোথায়? না বড় ভাইয়ের কোয়ার্টারেই থাকতে হবে- ও বাড়িতে তখন শুধুই স্বামী-স্ত্রী। ছেলেটি চট্টগ্রামে, নেভিতে কমিশনড র‍্যাংকে রিক্রুট হয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে আর মেয়েটি ব্যাংকার স্বামীর সঙ্গে সিলেটে সংসার পেতে বসেছে- সুতরাং ছোট বোনের জন্য আলাদা বাসার ব্যবস্থা কেন করতে হবে? গত কয়েক বছর ধরে তাই একত্রেই বসবাস। মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে, রেগুলার ছাত্রী হয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করছে। তার স্বপ্ন অনার্স এম.এ পাস করে সে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হবে, নয়তো বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে ডিসি হবে।

কিন্তু বিধবা মায়ের মন কি অমন স্বপ্ন দেখতে পারে? মা তো চান যে মেয়ের বিয়ে হোক, কোলে বাচ্চা আর মাথায় স্বামীর সোহাগ নিয়ে সে খুশিতে ডগমগ করুক। মেয়ের জন্য মনে মনে পাত্র খোঁজেন, কিন্তু লাভ হয় না। প্রথমেই কথা তোলে পাত্রপক্ষ, কত দেবেন? তো অমন ধরনের লোকেদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলা যায়। তাদের কারুর দাবি, দুই লাখ, কারুর দাবি তিন লাখ সেই সঙ্গে গয়নাগাটি আর সাজ পোশাক দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে সাজিয়ে দিতে হবে তার শোবার ঘর আর বসার ঘরও। এমন সব কথা বলে- যে, শুনলে ভিরমি খেতে হয়। তবু ওরই মধ্যে একটি ছেলেকে পছন্দ হয়েছিলো

বড় ভাইয়ের। ছেলেটি ডাক্তার, তবে তার দাবি অতো বেশি নয়, তারও বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য টাকার দরকার ছিলো, লাখ খানেক টাকা পেলেই তার চলবে, এমন কথা সে জানিয়েছিলো। এদিক থেকে রাজিও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে শুনলেন, ছেলে রাজি নয়, সে জানতে পেরেছে মেয়ের নাকি আগে বিয়ে হয়েছিলো, তালাক হয়ে যাওয়া মেয়েকে সে কেন বিয়ে করবে?

এই রকম যখন অবস্থা তখন এই প্রস্তাব পাওয়া যায় বড় ভাইয়ের বন্ধু আনসার আলীর মারফত। প্রথমে তো বিশ্বাসই হতে চায়নি। শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে আপত্তি তোলার কিছু নেই, বংশ নিয়ে না, ধন সম্পদ নিয়ে না, চাকরিবাকরি নিয়ে না। শুধু একটাই খুঁত যে বয়স একটু বেশি। তা কত আর বেশি। আনসার সাহেব বলেন, এই ধরেন, চল্লিশ-টল্লিশ হবে আর কি। তো ঐ কথা শুনে ভাবি হি হি করে হেসে ওঠেন। বলেন, পুরুষ মানুষের চল্লিশ বছর কি একটা বয়স হলো ভাই সাহেব। আজকাল তো ছেলেদের ওটাই বিয়ের বয়স। সেশনজটের জন্য লেখাপড়া শেষ করতেই পঁচিশ-ত্রিশ বছর হয়ে যায়। তারপর চাকরিবাকরি জোটাতে ধরুন আর পাঁচ-সাত বছর। তাতে কতো বয়স হয় হিসেব করুন?

তার কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। কিন্তু আনসার সাহেব হাসেন না। বলেন, আপনারা হাসছেন কেন? ভাবি সাহেব কী মর্মান্তিক কথাটা বলেছে, চিন্তা করে দেখেছেন? এ দেশে মানুষের গড় আয়ু কতো? যদি পঞ্চাশ বছর হয় তাহলে চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করলে তার দাম্পত্য জীবন হয়ে দাঁড়ায় মাত্রই দশ বছরের। এখন চিন্তা করুন ঐ দশ বছরে সে ছেলেমেয়ে কীভাবে মানুষ করবে? আর পাকাপাকিভাবে বসবাসের জন্য ঘরবাড়িই বা কখন বানাবে, চিন্তা করে দেখুন।

আনসার সাহেবের স্ত্রীই স্বামীর কথার জবাব দেন। বলেন, তোমার ভাবনা নিয়ে তুমি থাকো। বশিরুল্লাহ ভাইয়েরও সমস্যা নেই। মাশআল্লাহ তার অনেক টাকাও এখন। লন্ডনে বাড়ি, ইউনিভার্সিটিতে চাকরি, ওখানকার বাঙালি সমাজে কতো নাম-ডাক–

এই রকম আলাপ চলে দু-তিনদিন। তারপর গত পরশু দিন মেয়ে দেখতে আসার ঘটনা। ঐ দিনই রাবেয়া প্রথম দেখলেন পাত্রকে। পরিচয় পাওয়ার আগে তো আন্দাজও করতে পারেননি যে অমন মোটাসোটা মাথায় টাকঅলা মানুষটা তার মেয়ের বিয়ের পাত্র হতে পারে। প্রথম দর্শনে খুবই খারাপ লেগেছিলো তাঁর। এক ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ সময় ভাবি গিয়ে পাশে দাঁড়ান। আর বলেন, তোমার কি পাত্র পছন্দ হয়নি? উঠে এলে কেন?

তখন জবাবে মুখ ঘুরিয়ে চোখে চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, না পছন্দ হয়নি ভাবি।

তাহলে আনসার ভাইকে জানিয়ে দিই খবরটা যে মেয়ের মায়ের পাত্র পছন্দ হয়নি, যাই বলি গিয়ে?

জামিলা ভাবির ঐ ধরনের খোঁচা দিয়ে বলা কথা রাবেয়ার মনকে আরও বেশি মুষড়ে দেয়।

জামিলা ভাবি, বোধহয় বুঝতে পারেন। তিনি ননদের হাত ধরে বলেন, তুমি চিন্তাটিন্তা বাদ দাও বুঝলে? মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে, তা পাত্র যেমনই জুটুক। সবই তো কপাল, তুমিও জানো, আমিও জানি, না হলে সীমার আব্বা ওভাবে চলে যায়? শাহেদ ভাই বেঁচে থাকলে কি তোমার এতো চিন্তা হতো? বলো? পাত্রের বয়স একটু বেশি, কিন্তু দোজবরে তো নয়। তাহলে আর আপত্তি করার কী কারণ থাকতে পারে বলো?

রাবেয়া মনে মনে হিসেব করেন। কতোদিন হলো শাহেদ মারা গেছেন। উনি বেঁচে থাকলে কি এই রকম প্রস্তাবে রাজি হতেন? তার মনে হয় না, কারণ মেয়েকে কাছে রাখবেন এই আশাতেই তো মেয়ের ঐ বিয়েটা দিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার বারান্দায় আসেন জামিলা ভাবি। এবার বলেন, যাও, তুমিও দু'চারটা কথা বলো, না হলে কী ভাববেন ওরা?

সীমার সঙ্গে কথা বলেছে?

না, অন্যদের সঙ্গে আগে কথা হয়ে যাক, তখন দু'জনকে ঘরে রেখে আমরা সবাই এ ঘরে ও ঘরে সরে থাকবো– ওরা তখন আলাপ করুক- দু'জনে দু'জনকে বুঝতে পারবে। আমাদের সীমা তো সিরিয়াস টাইপের মেয়ে, সেটা বশিরুল্লাহ বুঝে নিক, তাহলে ওকে আরও বেশি পছন্দ করবে।

জামিলা আবার ননদের হাত ধরেন। বলেন, তুমি অমন মুখ গোমড়া করে আছো কেন, বলো তো? যদি পছন্দ না হয় তো বলে দিলেই হবে যে, আমরা মেয়েকে বিদেশে পাঠাতে চাই না, ব্যস তা হলেই হয়ে গেলো।

প্রায় চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ মিনিট রাবেয়া আসর থেকে বাইরে সরে ছিলেন। মনের ভেতরে দুশ্চিন্তাটা ওলটপালট করছিলো, কী করবেন তিনি? অমন একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবেন, শুধু বিয়ে দেওয়াই তো নয়, মেয়েকে চিরকালের জন্য বিদায় করে দেবেন? হ্যাঁ, চিরকালই তো মনে হয় তার। যদি মেয়েকে নিয়ে না আসে কখনো? কিংবা, মেয়ে নিজে আসতে চাইলেও আসতে না দেয়? তাহলে এই যাওয়াই তো হয়ে যাবে চিরকালের জন্য যাওয়া। তিনি কি কখনো যেতে পারবেন? অতো দূরে? একা একা?

জামিলা ভাবি তৃতীয়বারের মতো বারান্দায় আসেন, তারপর ননদের হাত ধরে তাকে আসরে বসান। বলেন, নেন ভাবি আপনি কিছু বলুন, আমরা শুনি।

রাবেয়া ভয়ানক বিব্রত বোধ করেন। তিনি কী বলবেন? বলার মতো কথা খুঁজে পান না। তবু জিজ্ঞেস করেন, আসল বাড়ি কোথায় ছিলো, ইন্ডিয়ায়? সিলেট অঞ্চলে? বশিরুল্লাহ মাথা নাড়ায়। বলে, জি না আসামে, ডিবরুগড়ে। পার্টিশনের পর আমার আব্বা সিলেটে আসেন। ওখানে বাড়ি আছে। চাচা-ফুফুরা থাকেন।

ওরা কেউ ঢাকায় আসেননি?

জি না। বশিরুল্লাহ মাথা নাড়ায়। বলে, খবর দেওয়া হয়েছে। হয়তো দু-চারদিনের মধ্যে এসে যাবে।

দেশে ফিরবেন না?

হ্যাঁ ফিরবো, সব জায়গাতেই তো এখন আমার দেশ, আসামে জন্ম, সেটা যেমন দেশ, বাংলাদেশে বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন, এটাও তেমনই দেশ, আবার ইউকে'তে চাকরি, বসবাস, তাই ওটাও দেশ।

আনসার সাহেব খোলা গলায় হেসে ওঠেন। বলেন, বাহ্ বেশ বলেছো। তোমার কাছে তিন দেশের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া মানে দেশে যাওয়া যেমন, তেমনি দেশে ফেরাও বটে। বাহ্ খুব সুন্দর বলেছো। এটাই হলো ইন্টারন্যাশনালিজমের আসল অর্থ।

ঐ একটা কথা নিয়ে এমন আলাপ শুরু হয়ে গেলো যে, রাবেয়ার অন্য কথা বলার সুযোগই হলো না। তাছাড়া আর কিছু বলারও ছিলো না তার। কারণ বশিরুল্লাহ পারিবারিক খবর তো আনসার সাহেব আর তার মিসেসের কাছ থেকে তো আগেই জেনেছিলেন। আলাপ যখন জমে উঠেছে, তখন রাবেয়ার নজর যায় পাশের সোফায় বসে থাকা সীমার দিকে। দেখেন, মেয়ে খোলা জানালার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আলাপের দিকে তার মন নেই।

ঐভাবে কতোক্ষণ চলতো বলা মুশকিল। ঐ সময় চা এসে যায় এবং মামা-মামানি আর আনসার দম্পতির মধ্যে চোখের ইশারায় কিছু যেন বলাবলি হয়। চা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু বেরিয়ে যান, আর তারপর যান অতিথি মহিলাকে নিয়ে মামানি, সবার শেষে মা-

বশিরুল্লাহর সীমার সঙ্গে লম্বা আলাপে কী বলাবলি হয় বয়স্করা তা ঠিক বুঝতে পারেন না। তবে অনুমান করেন, আলাপটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। হলে বশিরুউল্লাহকে সহজ আর স্বচ্ছন্দ দেখতে লাগতো না আর সীমারও হালকা হালকা মেজাজ থাকতো না।

রাবেয়া মেয়ের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করেন কেমন লাগলো মানুষটাকে।

সীমা মায়ের কথা শুনে হাসে। বলে, কেমন আবার লাগবে? যেমন মানুষ, তেমনই লাগলো। তবু, ভালো না মন্দ, তা বলবি না।

এর মধ্যে আবার ভালো-মন্দের কী আছে? দেখলাম মোটাসোটা, টাক মাথা, মাঝবয়সী একজন মানুষ, স্বভাবটা গম্ভীর, তবে কথাবার্তা ভালো বলে। বেশ ইন্টেলিজেন্ট– এই পর্যন্ত বলে মেয়ে থেমে যায়। মা তখন বলেন, ব্যস?

হ্যাঁ, ব্যস। মেয়ে আবার বলে।

তোর পছন্দ হয়েছে?

কিসের পছন্দ? মেয়ে ভুরু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকায়।

বাহ্ ওরা মেয়ে দেখতে এসেছে, তাই তোর সঙ্গে আলাপ করতে দেওয়া

হলো। পছন্দের কথা আমরা জানতে চাইবো না? রাবেয়া মেয়ের চোখের ওপর নজর রাখে।

কিন্তু আমি তো বলেছি, এখন আমি বিয়ে করবো না, সামনে পরীক্ষা, পরীক্ষা হোক, পাস করি, তখন ভাববো– আগে বিয়ে করবো, নাকি চাকরিতে ঢুকবো।

তুই তাহলে বশিরের সঙ্গে কী আলাপ করলি?

আলাপ আর কী করবো? বললাম, গরু-ছাগলের মতো মেয়ে কিনতে এসেছে, খোঁজ করলে পেয়েও যাবে, তবে হুট করে পাবে না, সময় লাগবে।

আর তোর কথা? এবার মামানি জিজ্ঞেস করেন।

আমার আবার কী কথা? সীমা আলাপের কথা স্মরণ করে। তারপর বলে, আমি জানিয়ে দিয়েছি, বিদেশে গিয়ে থাকার কোনো রকম ইচ্ছে বা আগ্রহ আমার নেই, আমি দেশের বাইরে কোথাও যাবো না।

ওমা, সেকি! মিসেস সাকিনা আনসারের বিস্ময় যেন থই পায় না। বলেন, অমন কথা বলে দিয়েছো? সর্বনাশ! এতো চেষ্টা, এতো আয়োজন, সব ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে? অমন পাত্র পাওয়া যে ভাগ্যের ব্যাপার, তা কি তুমি বোঝো না?

সীমা হাসে। বলে, না আন্টি, তা আমি বুঝি না- আর বুঝতেও চাই না।

এই পর্যন্ত বলেই সীমা নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে তারপর বিছানায় গড়িয়ে পড়ে।

নিজেকে তার বেশ ভারমুক্ত লাগছে- কারণ পাত্রকে নিজের মতামত সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে। এখন আর কিছু ঢাক ঢাক গুর গুর করার সুযোগ রইলো না, না তার দিক থেকে, না ওদের দিক থেকে। এমনভাবে কথাটা যে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সে কখনো কল্পনাও করেনি।

তবে নিজের বোকামির ফলটা সে রীতিমতো টের পেতে লাগলো, ঐ রাত থেকেই। মামা-মামানি তো তার সঙ্গে কথা বলেনই না, এমনকি মাও কেমন যেন মুখ ফিরিয়ে রাখেন। সে বুঝতে পারে বোকামিটা কোথায় করেছে- পাত্রের কাছে কী বলেছে সেটা তার মামানি বা সাকিনা বেগমের সামনে বলা উচিত হয়নি। তারা হয়তো এমনিতেই জানতেন পাত্রের মুখ থেকে। কিন্তু তার ফল এমন সরাসরি হতো না। এখন সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার দায়টা পুরোপুরি তার ওপর পড়বে। পাত্রের মুখ থেকে শুনলে এমন ভাবারও সুযোগ ছিলো যে ও কথা মেয়ে বলেনি। আসলে পাত্র মত বদলে ফেলেছে, তাই মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে ওই সব উল্টোপাল্টা কথা বলে। ছি ছি, কী বোকামিটাই না সে করেছে। নিজেকেই ধিক্কার দেয় সে।

কিন্তু সকালবেলা মগজে ঐ চিন্তাটা ছিলো না। তখন মনে হচ্ছিলো উল্টো কথা। কারণ বারবার করে বশিরুল্লাহর চেহারাটা মনে পড়ছিলো। লোকটা স্থির আর শান্ত ভঙ্গিতে সোফায় হেলান দিয়ে একইভাবে বসে ছিলো, তার মুখ থেকে অমন কথা শোনার পরও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, তার মানে কি সে নিশ্চিত যে নাসিমা মুর্শেদকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে পারবে! মেয়ে যা-ই বলুক, পাত্রের তাকে পছন্দ হয়েছে আর এটাই তার বিয়ের ব্যাপারে শেষ কথা।

চিন্তাটা মনের ভেতরে অনেকক্ষণ জেগে থাকে, সাজিদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত। দু'জনায় বসে আলাপ করার ফল তো সেই অনিশ্চিত অবস্থাই। এক. পাত্রকে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা করা, তাতে শেষ পর্যন্ত কাজ হবে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও। আর দুই. দু'জনায় কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলা- শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে কি না জানে না, তবু করার মতো দুটো কাজই তারা খুঁজে বের করে। শেষের কাজটা খুবই সহজ হতে পারে যদি সাজিদের একটা চাকরি জোটে, এই তো দাঁড়ালো দু'জনার চিন্তা-ভাবনার ফল।

পরের দিন ক্লাস করতে যায় সীমা। ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে ঢোকার সময় ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়। কিন্তু কোথাও সাজিদকে দেখতে পায় না। ক্লাস শেষ করে লাইব্রেরিতে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ বইপত্র নাড়াচাড়া করে। ঐ সময় স্বাতী এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে, এই শোন তো, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমার সঙ্গে কথা? সীমা একটু অবাক হয়।

স্বাতী বলে, সাজিদকে তুই চিনিস?

হ্যাঁ চিনি, কেন? সীমা পাল্টা প্রশ্ন করে।

না এমনি, স্বাতী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, অনেক দিন ধরে জানাশোনা তাই না? কত বছর?

সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে, সীমা জানায়।

বেচারা হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, তোকে বিয়ে করার জন্য পাগল।

তুই কীভাবে জানলি? সীমা জানতে চায়। বলে, তোকে কেউ বলেছে?

কেউ বলবে কেন? আমি নিজের চেখে দেখলাম আজ।

কী দেখলি?

দেখলাম ডেইলি নিউ হরাইজেন অফিসে বসে আছে, ম্যানেজিং এডিটরের সঙ্গে দেখা করবে।

তো চাকরির জন্য দেখা করবে সেটা তোকে কে বললো?

বাহ, ও নিজেই বললো।

সীমা কিছুই বুঝতে পারে না। সে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, তুই ওই পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলি কেন?

স্বাতী এবার যেন লজ্জা পায়। বলে, তুই আমিনকে চিনিস না?

দেখিনি, তবে নাম শুনেছি, সাজিদের কাছে, ওর ছেলেবেলার বন্ধু, খবরের কাগজে চাকরি করে।

আমি ওরই কাছে গিয়েছিলাম একটা কাজে, স্বাতী জানায়।

এবার গোটা ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারে সীমা। আর তাতে হাসিও পায় তার। বলে, আমিনের তো চাকরি আছে, তাহলে তোদের দেরি কেন?

কিসের দেরি?

তোদের বিয়ের?

মাথা খারাপ? স্বাতী উড়িয়ে দিতে চায় কথাটা। বলে, তুই তো জানিস ওর মা নেই, বাপও অসুস্থ, এখন যদি ওকে বিয়ে করি তাহলে আমাকে সোজা হেঁসেলে গিয়ে ঢুকতে হবে। তখন আমার মাস্টার্স ডিগ্রির কী হবে? গানের রেওয়াজ কখন আর কোথায় করবো? বল তুই?

হাসতে হাসতে দুই বান্ধবীর আলাপ। সাধারণত স্বাতী এতো অন্তরঙ্গভাবে আলাপ সালাপ করে না। আজ কী হয়েছে কে জানে। বিকেলের শেষ ক্লাস শেরে বেরুতে বেরুতে বলে, ঐ দেখ, গাছতলায়, চিনতে পারিস? সীমা দেখতে পায় তরুণটিকে, তারপর জানতে চায়, তোদের কি কোনো প্রোগ্রাম আছে আজ? কোথাও যাবি?

আরে নাহ। ও প্রায়ই আসে এইরকম সময়।

তারপর?

তারপর আবার কী? এমনি এমনি ঘুরি। ফুটপাত ধরে হাঁটি, গাছতলায় বসে থাকি, কখনো গানের কলি গুনগুন করি, কখনো ছেলেবেলার গল্প শুনি।

বাসায় ফিরিস কখন? সীমা জিজ্ঞেস না করে পারে না।

কেন? সন্ধ্যায়, সন্ধ্যার পর কি বাইরে থাকা ঠিক?

সীমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে স্বামী সোজা হেঁটে চলে যায় আমিনের দিকে। তারপর মুখোমুখি হয়ে কী যেন বলাবলি করে, শেষে সীমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার হেসে গাছের ছায়ার নিচ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যেন চলে যায়।

যতোক্ষণ চোখের আড়াল না হয় ততক্ষণ সীমা দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার অবাক লাগে, কোনো রকম উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই স্বাতীর। কারণ সে জানে, তার নিজের জীবনের জন্য কী ভালো হবে সেটা নিয়ে বিচার বিবেচনা অন্য কেউ করবে না, সেটা করবে সে নিজে। কথাটা শুনেছিলো সে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়। ফাইনাল ইয়ারে তানজিলা আপার মুখে, ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা এক্সকার্সন যাবে, কাছেই, ময়নামতিতে। আয়োজন প্রায় শেষ, ঐ জানা গেলো, তিনটি মেয়ে যাচ্ছে না, তাদের অভিভাবকরা রাজি নন। খবরটা জানার পর কয়েকটি মেয়ে গিয়েছিলো ঐ মেয়েদের গার্জেনদের বুঝিয়ে রাজি করাতে। রাজি তো করাতে পারেইনি, উল্টো ধমক খেয়েছিলো। তখন ঐ কথা বলে তানজিলা আপা, মাথা উঁচু করে স্পষ্ট উচ্চারণে। বলেছিলো, মেয়েদের ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখার মনোভাব ঠিক নয়। তাতে মেয়েদের মনে আঘাত লাগে। তারা হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়, তাদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

ঠিক ঐ সময় কোত্থেকে যেন মাঝবয়সী মুনশি টাইপের লোকের আবির্ভাব ঘটে। লোকটা খুঁড়িয়ে হাটে। হাতে লাঠি। আসলে বোধ হয় পাগল। সে লাঠিখানা মাথার ওপর দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করতে আরম্ভ করে।

বলে, ভাগ তরা, বেশরম বেহায়া মাইয়া। তরা ভাগ এইহান থিকা, মাইরা ঠ্যাং ভাইংগা দিমু, গেলি?

সেদিন মেয়েরা ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। পরের দিন যথাসময়ে ছখনা বাস বোঝাই হয়ে রওনা হলেও এক্সকারসন ভালো জমে না। ময়নামতি মিউজিয়াম দেখা হয়েছিলো, নতুন খনন কাজ চলছিলো যেখানে সে জায়গাটাও দেখা হয়, ওখানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসবাস ছিলো এসব খবর ওখানকার এক ভদ্রলোক ব্যাখ্যা করে বোঝায়। তবু, কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিলো। ঐ মেয়ে তিনটি সঙ্গে না থাকার জন্য কি না তা অবশ্যি কেউ বলতে পারেনি।

তবে ঘটনার শেষ ওখানেই হয়নি। ওই মেয়েদের মধ্যে একজন মানে যাদের বাড়িতে খুব কড়াকড়ি পর্দা মানার নিয়ম, তাদের একজন 'নাহার'-পুরো নাম খায়রুন্নাহার। লাপাত্তা হয়ে যায়। খবরটা চেপে রাখার চেষ্টা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না, কারণ দু'তিনদিন পর মেয়ের এক মামা, ইউনিভার্সিটিতে আসেন মেয়ের খোঁজ করতে। যদি কেউ কোনো খবর বলতে পারে। ভদ্রলোক কোনো খবর জোগাড় করতে পারেননি। তবে পরে জানা যায় যে নাহার একটি মেডিক্যালের ছাত্রকে ভালোবাসতো। বাড়ি থেকে আপত্তি ছিলো বলে, তারা কাউকে না জানিয়ে কাজির অফিসে গিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে প্রথমে, তারপর পালিয়েছে।

অবশ্যি বেশিদিন তারা লুকিয়ে থাকতে পারেনি। নাহার ঢাকার বনেদী ঘরের মেয়ে, তাদের বাড়ির লোকেদের বেজায় দাপট। দিন দশেক পরই তারা মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে। আর তার দু'দিন পর মেয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে। ছেলেটার কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত, সে খবর কেউ বলতে পারেনি।

সীমার মনের ওপর ঘটনাটা বড় রকমের দাগ কেটে যায়। তার মনে হতো, ঐ ঘটনা তার নিজের জীবনেই ঘটতে পারতো। কারণ অল্প কিছুদিন আগে ঐ রকম ঘটনা তার নিজের জীবনেই ঘটে গেছে- তার জীবনে যা ঘটেছে তা অবশ্যি প্রেমের নয়। তার পছন্দ-অপছন্দের, ভালো-লাগা মন্দ-লাগার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান আর স্বপ্নময় ভবিষ্যতের- তবু পরিণতি একই রকম হতে পারতো। যদি ঐদিনই তালাক না হতো। তাহলে আর কি কোনো পথ খোলা ছিলো তার জন্য। তার সব মনে পড়ে, তার বিয়ে, তালাক, বাবার মৃত্যু। রংপুরের বাড়িতে থাকতে না পেরে মায়ের ঢাকায় চলে আসা, এসব ঘটনা আর এমনকি আগের?

এক্সকার্সন-এর ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন তার মনের মধ্যে ঐসব অল্প অতীতের ঘটনাগুলোর রেশ জেগে ছিলো। তাই সে সবার কাছে বলতে শুরু করে যে নাহার আত্মহত্যা করেনি, ওকে মেরে ফেলা হয়েছে, আর ওর সদ্য বিয়ে করা স্বামীও হারিয়ে যায়নি, তাকে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাহারের সঙ্গে আজকাল স্বাতীর তুলনা করে সে। আর মনে মনে স্বাতীকে সাবাসী দেয়। একই সঙ্গে সে নিজেও মনে মনে শক্ত হয়। না, নাহারের মতো সে আত্মহত্যা করবে না, পালাবেও না। মালেকের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়ার সময় সে অমন ধরনের কথা ভাবতো, একদিন আব্বাকে কথাটা সে জানিয়েও ছিলো। কিন্তু এখন বোঝে ওটা তার ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো, ধারণাটাও ছিলো ভুল আর আব্বাকেও অমন কথা বলা তার ঠিক হয়নি। এখন সে বোঝে। তাই অমন কথা তার কখনও মুখ দিয়ে বেরুবে না। কেন মরতে চাইবে সে? সে বরং বাঁচতে চাইবে পরিপূর্ণভাবে, স্বচ্ছন্দভাবে, সানন্দ মনে, ভালোবাসার মানুষটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তাতে যা হবার হবে। শুধু সাজিদ তার পাশে থাকলেই চলবে।

সেদিন ফুরিয়ে আসে তবু সাজিদের পাত্তা পাওয়া যায় না। ইউনিভার্সিটি এলাকায় মানুষজনের চলাচল কমে যায়। কেমন একটা থমথমে নির্জনতার ভাব নেমে যায় চারদিকে। ওরই মধ্যে দু'একজন ক্যান্টিনের মানুষকে আসতে অথবা যেতে দেখা যায়।

বাসায় ফিরে সীমা শুনতে পায় মামানির প্লেয়ারে সানাই বাজছে। কী হলো? তার অবাক লাগে, আজ বাসায় সানাই বাজে কেন? বাসায় মাকে দেখে না। জিজ্ঞেস করলে কাজের মেয়ে টুনি বলে, ফুপিজান মার্কেটে গেছে।

সে নিজে তেমন সাড়াশব্দ করে না। চুপচাপ বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পেটে খিদে, তবু।

কতোক্ষণ ওভাবে ছিলো বলতে পারবে না, বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুমের ভেতরে খুটখাট আওয়াজ হওয়াতে দেখে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে বাইরে বাতি জ্বলছে। সানাই-এর রেকর্ড তখনও বেজে চলেছে।

মা এসে জানতে চান, কীরে, শরীর খারাপ?

নাহ্, এমনি শুয়েছিলাম।

বাইরে থেকে এসে কাপড়ও তো ছাড়িসনি, কী ব্যাপার? কিছু হয়েছে?

আরে নাহ্। কী যে বলো তুমি, সীমা মাকে আশ্বস্ত করে। বলে, এসে শুনলাম তুমি কিছুক্ষণ আগে মার্কেটে গিয়েছো, তা এতো তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? কী কিনলে?

মেয়ের কথা শুনে মুখোমুখি তাকান রাবেয়া। তারপর বলেন, আমি নিউ মার্কেটের সেই চেনা জুয়েলারির দোকানে গিয়েছিলাম। দোকান খোলা, কিন্তু মালিক ভদ্রলোক নেই। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে এলাম।

কেন। হঠাৎ জুয়েলারির দোকানে, সীমা মায়ের মুখের দিকে তাকায়। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের কপালের ভুরু কুঁচকে ওঠাতে, রাবেয়া কেমন যেন থতমত খান। বলেন, না তেমন কিছু নয়- এমনি আর কি, তোর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে, কখন দরকার পড়ে বলা তো যায় না, গয়নাগুলো তো সেই কবেকার পুরনো, তোর দাদীর দেওয়া, কলকাতার এমবি সরকারের দোকান থেকে কেনা। ভাবলাম ওগুলো ঘষামাজা করে রাখি- তাছাড়া কোনো কোনোটার ওপর ডিজাইন তো খুবই পুরনো। ওগুলো ভেঙে নতুন কোনো ডিজাইনের গড়িয়েও নেওয়া যায়, কিন্তু লাভ হলো না। বললো, মালিক কখন ফিরবেন ঠিক নেই। যাবার সময় কাউকেই কিছু বলে যাননি। অগত্যা চলে আসতে হলো।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই মামানির সঙ্গে দেখা। সীমাকে দেখে খুশিতে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন। বলেন, হয়ে গেছে, তোর কাজ হয়ে গেছে, পাত্র তোকে পছন্দ করেছে এখন শুধু বিয়ের তারিখটা ঠিক করতে যা বাকি।

মামানির কথা শুনে সীমা কিছুক্ষণ হাবার মতো তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না। শোনে না, বোধ হয় তখন দেখেও না। বেশ কিছুক্ষণ পর একটু একটু করে তার হুঁশ হয়। রেকর্ড প্লেয়ারে সানাইয়ের সুর শুনতে পেরে তখনই তার চিন্তা করা উচিত ছিলো, ঘটনাটা কী? কেন সানাই বাজছে? একটা কিছু না ঘটলে এসব কি হয়? নাকি হওয়ার কথা? তাহলে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা, সীমার কথার কোনো পাত্তাই দেয়নি।

মামানির চোখে মুখে খুশির উচ্ছ্বাস তখনো ছলকে ছলকে উঠছে। মাকে ডেকে বললেন, রাবু, তোমাকে তো আমি বহুবার বলেছি, আমাদের সীমার জন্য ভালো ভালো সম্বন্ধ আসবে। ওর খুব ভালো ঘরে বিয়ে হবে। এখন চিন্তা করে দেখ, আমার অনুমান ভুল না ঠিক। ভাবো তো, তোমার মেয়ে কোথায় উঠে যাবে বিয়ের পর এমন ভাগ্য কয়জনের হয়? জামাই হচ্ছে বিলেতের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এ কি সোজা কথা। চিন্তা কর, এ কি স্বপ্নেও ভাবা যায়? শুধু ওর কথাই বা বলি কেন। তোমার কপালও কি কম? তুমিও কি আর এদেশে থাকবে? তুমি ছ'মাসও থাকতে পারো কি না সন্দেহ, সীমা তোমাকে নিয়ে যাবেই- তুমি হয়ে যাবে লন্ডনের মানুষ।

মামানির খুশির উচ্ছ্বাস এই ভাবেই বারে বারে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে।

তবে এসব কান্ড দেখে সীমার খুব খারাপ লাগে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে বিপদটা একেবারে ধেয়ে আসছে। আর সেই বিপদ সহজে কাটবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাবে না এমন একটা আশঙ্কা তার মনের মধ্যে এমনিতেই ছিলো। কিন্তু বিপদটা যে এতো তাড়াতাড়ি সামনে এসে পড়বে। এমন তার কখনো মনে হয়নি।

সে কিছুক্ষণ জানালার ধারে একাকী বসে থেকে মনটাকে শান্ত করে। তারপর মামার কাছে গিয়ে জানতে চায়, মামা বশিরুল্লাহ সাহেব কি আপনার বন্ধু আনসার সাহেবের বাসায় উঠেছেন?

আরে নাহ্। মামা হেসে ভাগ্নির অনুমানকে উড়িয়ে দেন। বলেন, ওকি অমন লোক, যে কারো বাড়িতে আশ্রয় নেবে? ও হোটেলে থাকে, শেরাটনে কেন? কী হয়েছে?

না। কিছু হয়নি, আমি ওর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই, ওর ঠিকানা আর ফোন নম্বর আপনার কাছে আছে?

হ্যাঁ আছে, এই তো! মাহতাব সাহেব নিজের পার্স বের করে তার ভেতর থেকে একখানা কাগজের চিরকূট বের করে ভাগ্নির দিকে এগিয়ে ধরেন। তারপর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকেন, বোঝো কারবারটা, দু'সপ্তাহ হয়ে গেলো তবু মানুষটা শেরাটনের মতো দামী হোটেলেই থাকছে, অথচ ঢাকা শহরে বন্ধু আছে আত্মীয় আছে—

আনসার কয়েকবারই বললো, কিন্তু এক কথা মানুষটার। ও বলে, ঢাকায় যতোদিন আছে, ও নাকি ঐ শেরাটনেই থাকবে, কারও ঘাড়ে চাপবে না।

ঠিকানা লেখা চিরকূটটা হাতে নিয়ে সীমা চুপচাপ নিজের ঘরে এসে পড়ার টেবিলে বসে। তার খুব রাগ হয় ঐ সময় সাজিদ কেন আজ দেখা করলো না? দেখা না করুক টেলিফোন তো করতে পারতো। রাস্তার ধারের কোনো ফোন বুথ থেকে একটা লোকাল কল করতে আর কতো পয়সা লাগে?

তার মাথার মধ্যে তখন একটা কথাই ঘুরছে, বশিরুল্লাহ কোনো কথাই কানে নেবে না। ও তাকে যেভাবেই হোক কবজা করতে চায়, না হলে একেবারে মুখের ওপর সে বললো যে বিদেশে গিয়ে থাকার কোনো রকম শখ, ইচ্ছে বা আগ্রহ কোনোটাই তার নেই। তারপরও সে মেয়ে পছন্দ হয়েছে এমন খবর কীভাবে পাঠায়? শুধু পছন্দ হওয়ার খবর নয়, বিয়ের তারিখ ধার্য করার তাগিদও সে দিয়েছে। এতেই তো স্পষ্ট বোঝা যায় যে লোকটা কিছুতেই তাকে ছাড়বে না।

কিন্তু সে কি ধরা দেবে? উঁহু, অসম্ভব। মরে গেলেও না। তার অস্তিত্বের ভেতরকার আত্মাটা যেন চিৎকার করে বলতে চায়।

এদিকে আবার যে কী হচ্ছে সে বুঝতে পারে না। সাজিদকে এতো করে বলা হলো, যেন লোকটাকে ভড়কে দেওয়ার ব্যবস্থা করে— তো কিছুই করলো না। কোথায় যে ডুব দিয়ে রইলো কোনো রকম খবর পাত্তা নেই! সে এখন কী করে? যদি সাজিদ কিছু একটা করতো, তাহলে কি লোকটা মামা আর মামানিকে মেয়ে পছন্দ হওয়ার খবরটা ঘটা করে জানাতো?

সানাইয়ের বাজনাটা তখন অবশ্য লাগছে তার। একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত কতো হয়েছে। বেশি রাত না হলে কথাটা সে বলতে চায় না। কারণ জানে, মামা মামানি তার কথা শুনে চারদিকে ফোনটোন করে একটা বড় রকমের কাঁহিচাল লাগিয়ে দেবেন। সেই জন্য সে অপেক্ষা করে আর বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টায়। সাজিদের দেওয়া বই। উনিশ শতকের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে লেখা। এই বইয়ের তথ্য দিয়েই সে একটা টিউটোরিয়াল লিখেছিলো, তাতে স্যার এ প্লাস দিয়েছেন। আর সেজন্যেই সে বইখানা আর ফেরত দেয়নি।

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় ভাঁজ করা আধখানা খাতার পৃষ্ঠা পায়। আর দেখে তাতে চারটা লাইন লেখা। আগেও পড়েছে, তবু আবার পড়ে-

হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখবি কেন চেপে?
বলে ফেল ত্বরা ওদিকে নামছে বৃষ্টির ধারা
পথ হারাবার ভয় আর কোথা? দিগন্ত ব্যেপে
খোলা প্রান্তর, হয়ে যা না হেথা পাখি পথ হারা।

সাজিদেরই লেখা। কবিতা লিখতে চায় কিন্তু পুরোটা লেখে না। সব কাজই ওর ঐ রকম। অসমাপ্ত থাকে। আর সেজন্যেই তো সে নিশ্চিন্তবোধ করে না। তার একেক সময় ভয় লাগে।

দেখতে দেখতে নয়টা বেজে যায় দেয়ালের ঘড়িতে। দম দেওয়া পুরনো আমলের ঘড়ি পেন্ডুলাম দোলে আর টং টং আওয়াজ করে ঘন্টা বাজে। ওদিকে খাওয়ার টেবিল থেকে প্লেট চামচের আওয়াজ পাওয়া যায়। তার মানে খাওয়ার দেওয়া হচ্ছে। পুরনো নিয়ম, নটার সময় খাবার টেবিল, তারপর কিছুক্ষণ আবার ড্রয়িং রুমে বসা হবে। মামানি লিভিং রুম শব্দটা চালু করতে চেয়েছিলেন, পারেননি, এক্ষেত্রে মামার ইচ্ছাই টিকে গেছে।

ওদিকে উঁকি দিলে সীমা দেখতে পায় টুনি আর মা খাবার টেবিল সাজাতে ব্যস্ত। টুনি ডাক দিলে সবাই একে একে গিয়ে বসে। তারপর এটা-ওটা চলতে চলতে খাওয়ার পাটও শেষ হয়ে গেলো। সীমা তখনও দোটানায়, তার কথাটা কি বলবে? নাকি বলবে না?

খাওয়া শেষ করে একে একে সবাই গিয়ে বসার ঘরে বসে। ছোট রেকাবিতে করে পান মশলা টেবিলে রেখে যায় টুনি।

মামা মশলা চিবুতে চিবুতে বোনকে বলেন, রাবু আমি তাহলে ওদের বলে দিই কোন তারিখে অনুষ্ঠান হলে আমাদের সুবিধা। কমিউনিটি হলগুলোর বুকিং-এর লিস্ট তো আমরা পেয়েছি। তা দেখে ওদের জানিয়ে দিই কোন তারিখে আমাদের সুবিধা?

এ মাসটা বাদ দাও, মাত্র তো পাঁচটা দিন বাকি, মামানি পাস থেকে বলে ওঠেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, রাবু তুমি কী বলো?

মা একবার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকান, একবার ভাবির মুখের দিকে। তারপর বলেন, আমি কী বলবো, তোমাদের যা ভালো মনে হয়- সেটাই হবে-

না মা।

ঐ সময় দরজায় দাঁড়িয়ে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে সীমা। তার গলা অদ্ভুত শোনায় তখন। সে বলে, মামা, আমার কথা আছে এ ব্যাপারে। আমি মূল ব্যক্তিটির কাছে আমার কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু আমার কথা পাত্তা দেওয়া হয়নি। তাই আপনাদের কাছে বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি বরাবর বলে আসছি যে এমএ পাস না করা পর্যন্ত আমি বিয়ে করবো না। কিন্তু আমার কথা আপনারা শুনছেন না। উপরন্তু একটা মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ঐ ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে এনে আমার চেহারা দেখিয়েছেন— ভদ্রলোককে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছি যে বিদেশে যাবার বা বিদেশে বসবাস করার কোনো আগ্রহ আমার নেই। তারপরও আপনারা এ আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়ার জন্য জেদ ধরেছেন- এ ব্যাপারে আমি স্পষ্টভাবে আবার জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি আপনাদের পছন্দের ঐ পাত্রকে বিয়ে করবো না, যদি আপনারা একান্তই আমার বিয়ে দিতে চান, তাহলে যে ছেলেটিকে আমি ভালোবাসি তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিন। তার নাম সাজিদ হাসান, গতবছর সে ইতিহাসে এমএ পাস করেছে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে। যদি বিয়ে করতে হয়, তাহলে ওকেই আমি বিয়ে করবো। আর কাউকে নয়।

মোটামুটি একটা বক্তৃতা যেন। সীমা তার যা বলবার ছিলো তা বলে, নিজের ঘরে চলে যায়। এ দিকে এক প্রৌঢ় আর দুই প্রৌঢ়া হতবাক হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন। বিস্মিত আর হতবাক অবস্থাটা কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। মাহতাব সাহেব একসময় লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, রাবু তোর মেয়ের মাথায় মনে হয় দোষ হয়ে গেছে, ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

কিসের মাথার দোষ। মিসেস মাহতাব দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠেন। তার মনে তখন রাগ ফুঁসে উঠেছে। আর রেগে গেলেই আজকাল তার মুখ দিয়ে অরিজিনাল বিক্রমপুরী ডায়ালগ বেরুতে আরম্ভ করে। বলেন, মাথার দোষ ঠোষ কিছু না বুজছ? আস্তা শয়তানি। এক নম্বরের শয়তান তোমার ওই মাইয়া- কুন এক ফকিরনীর পোলার লগে পীরিত করছে, অহন তার লগে বিয়া দেওনের লাইগা আমাগো ফান্দে ফালাইবার চায়-

স্বামীর মুখের সামনে আঙুল তুলে শাসাতে শাসাতে বলেন, তুমি খবরদার অর কথায় কান দিবা না কইয়া দিলাম, হয় এই বিয়া করতে রাজি হইবো নাইলে বাইরাইয়া যাইবো এইখান থিকা, আমার সোজা কথা।

আর রাবু, তোমারেও কই, মহিলা ননদের মুখের সামনে তর্জনি খাড়া করে নাচাতে নাচাতে বলেন, মাইয়ার কথায় নাচবা না, বিয়া শাদি কি পোলাপানের খেলা? যারে মন চাইলো তারেই ধইরা বইলো- বংশ দ্যাখতে হইবো না? বাড়িঘর দ্যাখতে হইবো না? শিক্ষা দীক্ষা কী খবর লইতে হইবো না?

রাবেয়া খাতুন শুধু দেখে যান আর শুনে যান। কী বলবেন কী করবেন, সে ব্যাপারে তার মগজে কিছুই খেলে না। মেয়েটা যে কতো জ্বালাবে বুঝতে পারেন না। ওর বাবা যখন বেঁচে ছিলো, তখন তার পছন্দ করা পাত্র মেয়ের পছন্দ হয়নি, এখন বাপ নেই, আশ্রয়দাতা মামার পছন্দ করা পাত্রকেও তার পছন্দ হচ্ছে না। এখন তিনি কী করবেন? মেয়েটা কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলো? মনের ভেতরে কথা তোলপাড় করে কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোনো কথাই বের হয়

না। যেমন ভাবে বসেছিলেন, সেই একই ভাবে চুপচাপ আর স্থির হয়ে বসে রইলেন।

মিসেস মাহতাবের বকাবকি এখনও সমানে চলেছে। তখনও বলছেন তর মামার কথা হোনস না। তর আর কে আছে ক? মামায় যুদি খেদায় দেয় তো ফকিরনী হইয়া যাইবি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি, বাইবা দেখছস কুনো সময়?

রাতটা কীভাবে কাটে কেউ জানে না। মায়ের খবর মেয়ে বলতে পারবে না। আর মেয়ের খবর মা বলতে পারবে না। অথচ দু'জনে ছিলো একই বিছানার দুই প্রান্তে।

রোজকার মতো সকালে সীমা প্রাইভেট টিউশনি করতে বেরিয়ে যায়। কলোনি থেকে ধানমন্ডি দুই নম্বর রোডের এক বাড়িতে যায় সে। একটি সিক্স-এ পড়ে, অন্যটি সেভেন-এ। অন্যান্য দিনের মতো সে দশটা পর্যন্ত পড়ায় না। দরকারি কাজ আছে বলে সাড়ে নটা বাজতে না বাজতে উঠে পড়ে।

রাস্তায় এসে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াবার পর ইতস্তত বোধ হয়। সে কি কল্যাণপুর যাবে? নাকি যাবে না। যাওয়াটা কি তার উচিত হবে?

গত তিনবছর ধরে পরিচয় কিন্তু সর্বমোট বোধহয় বার দুয়েক গেছে সে সাজিদদের বাড়িতে। যে দুবার গেছে, সেই দুবারই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছেন মহিলা তার মুখের দিকে। খারাপ কোনো কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি, কিন্তু যতোক্ষণ ছিলো, সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিলো মহিলা তাকে দেখে বিরক্ত হয়ে রয়েছেন। একবার যায় বই আনতে। আর দ্বিতীয়বার যায় ওর আব্বা হাসপাতাল থেকে প্রোস্টেট অপারেশন করে বাড়ি ফেরার পর। তবে হ্যাঁ, সাজিদের আব্বা, মজিদ সাহেব খুবই ভালো মানুষ। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন। মজার মজার কথা বলেন।

কল্যাণপুরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা শেষ হয় না। তার আগেই বাস এসে পড়ে এবং সেই বাসে সে উঠে পড়ে।

বাস স্ট্যান্ড থেকে ১২ নং রোড খুব দূরে নয়, তখন বেলা দশটার ভিড় রাস্তায়। মনের মধ্যে চিন্তা সাজিদকে পাবে কি না, না পেলে তখন কী করবে। নাকি শেষ পর্যন্ত সাজিদ পিছিয়ে যাবে। আর তাকে ঐ লোকটার গলা ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হবে দূরের অচেনা এক দেশে। চিরজীবনের জন্য। সাজিদের মুখখানা তার মনে ভাসে। তার মাথার ছোট করে ছাঁটা চুল, একটু লম্বাটে মুখ। ঠোঁট দুখানি ভারি নরম ফুলের পাপড়ির মতো, ঘাড়টা চওড়া আর মসৃণ, মুখখানিতে সর্বক্ষণ হাসির আভা ফুটে থাকে। যখন প্রাচীন সভ্যতার বিষয় নিয়ে কথা বলে তখন কান পেতে শোনা ছাড়া আর অন্যকিছু করার উপায় থাকে না। ছেলেদের নাকি খ্যাপামিতে পায় ভালোবাসার মেয়েকে একাকী নির্জনে পেলে আর সেই খ্যাপামিতে পেলে, অনেক ছেলে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চুমু টুমু খাওয়া বা জাপটাজাপটি করা এসব তো হয়ই। অনেক সময় নাকি চূড়ান্ত কাজটা পর্যন্ত করে ফেলে।

কিন্তু সাজিদের মধ্যে অমন খ্যাপামি জাগতে সে কখনো দেখেনি। খুব বেশি আবেগ জাগলে দুটো একটা চুমু হয়তো খাওয়া হয়েছে। আর সে কাজে বেশি আগ্রহ ছিলো তারই, সাজিদের নয়।

বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়ায় সীমা। যাবে কি যাবে না। সেই ইতস্তত ভাব তখনও তার মনে যেমন, তেমনি দুইপায়েও।

কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ সে আচমকা ডাক শোনে। আরে সীমা না?

সে মুখ ফিরিয়ে দেখে লাঠিতে ভর দিয়ে সাজিদের আব্বা পেছনে দাঁড়িয়ে। সে সালাম দিয়ে হাসে।

এদিকে কোথায়?

সাজুর কাছে এসেছিলাম, খুব দরকারি একটা কাজে।

তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে?

জি না এই একমাস পরেই—

কথা বলতে বলতেই মজিদ সাহেব বলেন, এই যে সাজু এসে গেছে। সীমা চোখ তুলে দেখে, সত্যিই সাজিদকে গেট দিয়ে বেরুতে দেখা যাচ্ছে, চোখে মুখে দ্রুতি আর উদ্‌ভ্রান্তির ভাব।

কাছে এসে বলে, তুমি এখানে?

হ্যাঁ, এলাম। খুব জরুরি দরকার— আমাকে তো কোচিংয়ে যেতে হবে।

ঠিক আছে। সীমা বলে, যেতে যেতে কথা হবে।

আমি তাহলে যাই, সীমা মজিদ সাহেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে। বাসার ভেতরে যাবে না? মজিদ সাহেব সীমার চোখে চোখে তাকান।

তখন সীমা হাসে, বলে, জি না আজ না, অন্যদিন যাবো, আজ খুব তাড়া আছে।

দু'জনে খানিকটা পথ হাঁটে তারপর সাজিদ একটা ফাঁকা গলিতে ঢোকে। বলে, এখন খবর বলো, কী হয়েছে?

তোমার খবর কী? গাজীপুরের?

ওটা হবে না। ডোনেশান দিতে পারলে কথা ছিলো। তবে হ্যাঁ, বোধহয় একটা চান্স পাচ্ছি?

কোথায়, কিসের?

ডেইলি হরাইজন-এর এডিটোরিয়াল সেকশনে। আমি দেখা করেছিলাম, অবশ্যি সবই আমিনের কল্যাণে। আমার সঙ্গে কথা বলে মনে হলো ওদের এডিটর সাহেব বোধহয় আমাকে পছন্দ করেছেন। বললেন ছোটখাটো লেখা দিতে, সাবজেক্ট ঠিক করে দিয়েছেন উনিই। আমি আজ লেখা দুটো দিয়ে আসবো। তোমার খবর বলো?

খুব খারাপ। সীমা জানায়। সেদিন খোলাখুলি ঐভাবে বলার পরও মামাকে জানিয়েছে আমাকে নাকি ওর খুব পছন্দ আর বিয়ের তারিখ ঠিক করতে বলেছে, তুমি এদিকে কিছু করোনি, তাই না?

করিনি মানে? সাজিদ বলে, আমি নিজে গিয়েছি আমিন আমার সঙ্গে ছিলো। ব্যাটা হিপো তোমার সব খবর জানে। ওই ভ্যালভ্যাল করে সব বলেদিলো। এমনকি তালাক দেওয়ার সময় সালেক না সাদেক, যে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে তাও বললো- ও সব খবর নিয়ে তারপর এগিয়ে এসেছে।

আমি যে খারাপ মেয়ে, সেটা বলোনি? বলোনি আমার চরিত্র খারাপ, ছেলেদের সঙ্গে মিশি।

বাহ্ বলিনি? কী যে বলো, আরে ওকথা যখন বললাম, তখন তো হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, তাতে কী হয়েছে, ছেলেমেয়েতে মেলামেশা করবে না? দে মে এনজয় সেক্স ইভেন ওসব আমাদের ওখানে কেউ ভাবে না? ইভেন দ্য স্কুল গোয়িং চিলড্রেন ডু হ্যাভ সেক্স, ইউ মে ফাইন্ড প্লেন্টি অব রিপোর্টস ইন দ্য নিউজ পেপারস। লোকটা বলে দিলো, বিয়ের আগে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও আমার মত বদলাবে না।

তাহলে? সীমা চোখে চোখে তাকায়।

তাহলে কী? সাজিদ পাল্টা প্রশ্ন করে।

ওরা যে বিয়ের তারিখ ঠিক করছে। হয়তো কার্ডও ছাপিয়ে ফেলবে। তুমি মানবে না? সাজিদ বলে, জানিয়ে দাও যে ওই লোককে তুমি বিয়ে করবে না। অমন হিপোপটেমাসকে কোনো মেয়ে বিয়ে করতে পারে না।

শব্দটার উচ্চারণ শুনে অমন অবস্থাতেও সীমার হাসি পায়। বলে, ওকে ঐ নাম কে দিলো?

আমিন। যখন ফিরে আসছিলাম তখন ও বললো, লক্ষ্য করেছিস ওর ঘাড় গলা বলে কিছু নেই। মাথা আর বডি একাকার। জলহস্তিদের অমন দেখায়। তো ওর নাম এখন থেকে হিপো।

হাসি বেশিক্ষণ থাকে না। মনের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া থাকলে হাসি পেলেও তা কি বেশিক্ষণ পারা যায়? সীমা বলে, আমি কাল মামা মামানি সবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে দিয়েছি যে আমি এখন বিয়ে করবো না, আর বিয়ে করলে একজনকেই করবো। তার নাম সাজিদ হাসান। তুমি বলেছো ব্যাপারটাকে ফেস করতে, আমি ফেস এইভাবে করছি। কী হবে জানি না। মামানি আমাকে বাসা থেকে তাড়িয়েও দিতে পারেন। মহিলা খুবই বদরাগী- তুমি কিন্তু দেরি করবে না, যা করার তাড়াতাড়ি করবে- না হলে আমি বাঁচবো না। তুমি দেখে নিও।

প্রকাশ্য রাস্তায় সীমা কান্নায় ভেঙে পড়ে। সাজিদ তার ঘাড়ে দুহাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। বলে, তুমি এতো ভেঙে পড়ছো কেন? অতো হতাশ হয়ো না। এটা বোঝো না কেন যে তুমি প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে, তোমার অমতে কেউ

কিছুই করতে পারবে না। আর আসল কাজ যেটা সেটা তো আমরা দু'জনে করবোই, ও নিয়ে তুমি চিন্তা করো না।

সাজিদ সামনের দিকে পা চালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলে। সীমা হাঁটতে হাঁটতে সাজিদের হাত মুঠো ভরে চেপে ধরে থাকে।

তারপর দু'জনে বাসে চাপে, নামে শাহবাগে। ক্যান্টিনে গিয়ে কিছু মুখে দেয়। তারপর সাজিদ বিদায় নেয়। যাওয়ার সময় একখানা একশো টাকার নোট সীমার হাতে দেয়। বলে, এটা রাখো। এখন তো মামার কাছে টাকা চাইতে মায়ের কাছেও না।

তোমার অসুবিধা হবে না? সীমা সাজিদের মুখের দিকে তাকায়।

না, কাল পুরনো একটা লেখার জন্য দুশো টাকা পেয়েছি।

কোন লেখা?

একটা অনুবাদ, অনেক আগে ছাপা হয়েছিল।

সাজিদ মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় আর সীমা পেছন থেকে তাকে দেখে। ঘাড়ে একটা ব্যাগ ঝোলানো মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখে হাঁটার সময়। মনে হয় দেখে দেখে খুব সাবধানে পা ফেলে যেন হেঁটে যাচ্ছে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, কোন দিকে হেঁটে যাচ্ছে সে? জীবনের দিকে? নাকি ধ্বংসের দিকে? আশার দিকে? নাকি হতাশার দিকে?

ঘাড়ে ব্যাগটা ঝোলানো, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে ক্লাস আরম্ভের দেরি নেই। কিন্তু আজ তার ইচ্ছে করে না। সকালবেলা বিছানা ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-জামা বদলে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ছে, কাউকে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি। এখন বেশ খারাপ লাগছে তার। ঐভাবে বাসা থেকে বেরুনো তার উচিত হয়নি, অন্তত মাকে তার বলে আসা উচিত ছিলো যে টিউশনি শেষে সে বাসায় না ফিরে ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবে। ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে কয়েক পা হাঁটার পরই দেখে রিকশা থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে স্বাতী আসছে। তাকে দেখে বলে উঠলো, ক্লাসে যাবি না?

না, আজ আর- সে গা মোড়ার ভঙ্গি করে।

কেন, যাবি না, চল্।

স্বাতী বান্ধবীর হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে।

সাহিত্যে আধুনিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা। এটা তৃতীয় ক্লাস, মোট ৫টা ক্লাস হওয়ার কথা। স্যার কী কী সব বলে গেলেন, তার মাথায় কিছুই ঢুকলো না। কয়েকটা নাম শুধু কানে গেলো। যেমন, নুস্ট হামসুন, এমিলি জোলা, যোহান বোয়ার, টমাস মান। এইরকম কিছু নাম তার মনে দাগ কাটলো, কারণ এসব নাম সে আগেও শুনেছিলো।

ক্লাস শেষ হলে, স্বাতী হাত ধরে টানে। বলে, চল লাইব্রেরির দিকে যাই, মাঝখানে দুটো পিরিয়ড অফ যাবি?

সীমা রাজি হয়। বলে, ঠিক আছে চল।

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অপরাজেয় বাংলার পাশ দিয়ে যাচ্ছে ঐ সময় স্বাতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

কী হলো, দাঁড়ালি কেন?

না, কিছু না, একটু দাঁড়া।

সীমা লক্ষ্য করে, সোসিওলজির চেয়ারম্যান স্যার আরও দু'জন টিচারের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছেন, সঙ্গে আরও একজন মোটা মতো ভদ্রলোক। গাড়িতে ওঠার সময় ওরা ঘুরে দাঁড়ালেই সীমা চমকে ওঠে, আরে! ঐ লোক এখানে কেন? পরক্ষণে মনে হয় বশিরুল্লাহ তো এখানকারই ছাত্র ছিলেন, কিছুদিন লেকচারের কাজও করেছেন। সে লক্ষ্য করে, স্বাতী একখানা খাতা তুলে ধরে মুখ আড়াল করে রেখেছে। সে জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, কী হলো, তুই আড়াল করে রেখেছিস কেন?

না, ও কিছু না। তুই চল, ওদিকে যাই।

স্বাতী হাত ধরে টানলে সেদিকেই পা বাড়াতে হয়। সে তবু জিজ্ঞেস করে, ওরা তো সবাই সোসিওলজির টিচার- তুই লুকোচ্ছিস কেন।

ঐ যে একজন মোটা মতো, টাক মাথা।

সীমা বলে, হ্যাঁ, ভদ্রলোক নতুন কিন্তু তুই লুকোতে চাস কেন? তুমি ওঁকে চিনিস?

হ্যাঁ, লন্ডনে থাকে, আমার খালাত বোনের স্বামী ছিলো।

স্বামী ছিলো? সীমা অবাক হয়। কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? সে জানতে চায়। স্বামী ছিলো মানে?

মানে এখন নেই, স্বাতী জবাব দেয়। বলে, ডিভোর্স হয়ে গেছে বছর দুই হলো, দুটো বাচ্চা, ছেলে আর মেয়ে। বারো চৌদ্দ বছর করে বয়স ওদের।

তোর বোন এখন কোথায়?

ওখানেই, স্কুলে চাকরি করেন এখন। লোকটা একেবারে পশু, মীনু আপাকে মারতো। মেরে একবার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলো- শেষ যেবার মেরেছিলো, সেবার মেয়েই পুলিশকে খবর দেয়। তারপর মীনু আপা ডিভোর্সের মামলা করে। ডিভোর্স হয়ে গেছে পুরোপুরি।

কিন্তু এখানে কেন ভদ্রলোক? ওঁর নাম কী?

এখানে কেন এসেছে, বুঝতে পারছি না, স্বাতী জানায়। বলে, ওর নাম কী? বশিরউল্লাহ না বশিরুদ্দিন, ঠিক জানি না। সবাই ওকে বশির ভাই বলে ডাকতো।

নাম শোনার পর সীমার মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। তবু সে জিজ্ঞেস করে উনি কি পিএইচডি করেছেন লন্ডনে?

তা ঠিক জানি না, স্বাতী বলে, কিছু একটা করেছে। নাহলে কলেজে চাকরি কীভাবে পায়?

কলেজে চাকরি করেন? ইউনিভার্সিটিতে নয়।

না, তা শুনিনি, পরে হয়তো চান্স পেতেও পারে।

স্বাতীর কাছ থেকে ঐ সব খবর শোনার পর, খুবই স্বস্তিবোধ করে সীমা। পরের দুটো ক্লাস আর করে না। সে বাসায় রওনা হয়ে যায়।

বসার দরজা খুলে দেয় টুনি। ঘরে ঢুকলে বলে, আইজ বাড়িতে কেউ নাই, বাড়ি একেবারে খালি।

কেন? মামা কোথায়? মামানি? সে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে না। কারণ জানে, মা ইস্কুলে গেছেন।

বেহান বেলা থেইক্যা কেমুন মুখ ভার দোনোজনার। খালুজান নাস্তা খাওয়ার পরই বাইরাইয়া গেলো। যাবার সময় খালাম্মারে শুনাইয়া গেলো যে আবসার সাবের বাসায় যাইতাছে।

তারপরই খালাম্মাও বাইরাইয়া গেলো। জিগাইলাম, কই যান খালাম্মা, তো আমারে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া কইলো, মরতে যাই।

তো ফের জিগাইলাম, কহন আইবেন? তো কইলো, যখন খুশি। মনে হয়, খুব ঝগড়া হইছে দোনোজনার মইদ্যে। আল্লায় জানে অহন কী হইবো।

সীমা টুনির মুখে বাসার ভেতরকার বিবরণ ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে করে অনেকক্ষণ ধরে শোনে। মনের দিক থেকে সে এখন খুবই শান্ত। যা শুনছে সবই যেন মজার ঘটনা। সে স্নান করে, ক্লান্তি আর অবসাদ দেহমন থেকে দূর করে প্রথমে। তারপর দিবাস্বপ্ন দেখতে বসে। দিবাস্বপ্ন অন্য কিছু নিয়ে নয়। সাজিদকে নিয়েই- কল্যাণপুরে যাওয়ার আজ হলো তৃতীয় দিন। বাড়ির ভেতর ঢোকেনি, কিন্তু গেট পর্যন্ত যাওয়া মানে কি আর বাড়িতে যাওয়া নয়? ওর আব্বা তো খুবই ভালো মানুষ তাকে যে অপছন্দ করেন না তা সে দিব্যি বুঝতে পারে। ভবিষ্যতে ওটাই হবে তার নিজের বাড়ি। তার আপন ঘর। শাশুড়িকে সে মানিয়ে নেবে, আবিদ মানে সাজিদের ছোট ভাই সেও তো ভালো, এমনকি বোন টুনুও। সে সুখী হবে, শুধু হবে না, সবাইকে সে সুখী করবে। তার মাকেও সে সুখী করবে। কীভাবে, সে জানে না, কিন্তু তার বিশ্বাস, মা তার সংসার দেখে সুখী হবেন।

দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতেই সে এক সময় জেগে ওঠে। সুখ তো দেখছে সে তার ভবিষ্যতে বিছানো রয়েছে। সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ সবাইকে সে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মা কোথায়? মা কেন নেই তার সুখ স্বপ্নের জগৎটির মধ্যে কোথাও? মা কি হারিয়ে যাচ্ছে? নাকি সে হারিয়ে যেতে দিচ্ছে, জেনে শুনেই দিচ্ছে?

দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে যায়। তবু কেউ বাসায় ফেরে না। সীমার ঐ সময় সাজিদের কথা মনে হয়। ওর সঙ্গে তার আলাপ হওয়া দরকার। বিশেষ করে বশিরুল্লাহ সম্পর্কে যা জেনেছে, সে সব তো জানাতেই হবে। তার মানে

আবার কল্যাণপুরে যাওয়া! সে মনে মনে তৈরি হয়। কল্যাণপুরে ওদের বাড়িতে ফোন নেই। কোচিং সেন্টারে ফোন আছে কিন্তু সেখানে তো ও বারোটার পর থাকে না। তাহলে? হঠাৎ তার মনে পড়ে ওর বন্ধু তো কাগজের অফিসে কাজ করে। তাকে খবর দিলেও তো চলে। কাগজের অফিসের নাম্বার ফোন গাইডেই পাওয়া যায় এবং সে আমিনুল ইসলামকে পেয়েও যায়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে সাজিদ তখন ঐ অফিসেই উপস্থিত আছে।

সাজিদকে সে পুরো খবরটা জানায় না। শুধু বলে, আমি বশিরুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবো, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে, তুমি আজ পাঁচটায় শহীদ মিনারে এসো, কথা আছে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। এবার সে একটা কিছু ফয়সালা করে ফেলবে, হয় এপার, নয়তো ওপার। মাঝামাঝি ঝুলতেই থাকবে, এটা কোনো জীবন হলো? সাজিদকে সে বলে দেবে, সংসার না করতে পারি, কিন্তু আপাতত বিয়েটা তো করতে পারি?

মা আজ আগেই বাসায় ফেরেন। মেয়েকে দেখে বলেন, আমি বাসা দেখতে দিয়েছিলাম। আজ বড় ভাই আর ভাবির মধ্যে খুব ঝগড়া হয়ে গেছে, আমরা এখানে থাকলে ওদের শান্তি নষ্ট হচ্ছে, তাই ভাবছি, আমরা আলাদা থাকি। তাছাড়া এ বাসা তো এমনিতেই ভাইজানকে ছেড়ে দিতে হবে। ওঁরা চলে যাবেন উত্তরার বাড়িতে। ওখান থেকে কি আমার পক্ষে রোজ আজিমপুরে আসা সম্ভব হবে। তাই ভাবছি একটা দুই কামরার বাসা ভাড়া নেওয়াই ভালো।

গত রাতের কথা, বা বিয়ের তারিখ সম্পর্কে মা কিছুই বললেন না।

আমাকে নিয়েই মামা মামানির ঝগড়া হয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ, তা তো হবেই, তুই যা আরম্ভ করেছিস?

একটু থেমে আবার বলেন, রাবেয়া, আচ্ছা, তুই ঐ ছেলেটার কথা বলতে গেলি কেন?

ঐ যে, কী যেন নাম, সাজিদ না ফাজিদ, কেন বলতে গেলি ওর নাম?

কেন বলবো না বলো? ওঁরা অমন একটা আধবুড়ো লোককে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইবেন আর আমি কিছুই বলবো না? সাজিদের বয়স কম, ভালো লেখাপড়া জানে, রেজাল্ট ভালো, শুধু চাকরি পায়নি। চাকরি পেয়ে গেলে ও কম কিসে বলো? আমি সেই জন্যই ওর নাম বলেছি।

ঠিক আছে, বলেছিস ভালো করেছিল। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বলেন, এখান থেকে আমার চলে যাওয়াই ভালো। আমি ভেবে দেখেছি-

সীমা মায়ের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে। রিকশা নিয়ে আসতে দশ-বারো মিনিট লাগে। পৌঁছে দেখে এক গাছতলায় পেছনে দু'হাতের ওপর শরীরের ভর রেখে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশ দেখছে। কথা বেশি হয় না। শুধু এটুকু বলে যে তার জন্য মামা মামানির মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে, মা অন্য কোথাও বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করতে চান, বাসা দেখা হচ্ছে।

আর শোনো, সীমার গলার স্বর অন্যরকম হয়ে যায়। বলে, আমরা কি এখনই বিয়ে করতে পারি না?

সাজিদ অবাক হয়, আবার কিছুটা বিরক্তও। বলে, এই কথা বলার জন্য তুমি ডেকেছো?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। না হলে বার বার ঝামেলায় পড়তে হবে আমাকে- বলো, আমরা কি কাজীর অফিসে গিয়ে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে পারি না?

গার্জেনদের জানাবো না?

না, এখনই কিছুই বলা হবে না কাউকে। সীমা বলে, শুধু রেজিস্ট্রিটা হয়ে থাকবে, তারপর যখন ফর্মাল বিয়ে হবে, তখন সবাই জানবে-টানবে- তার আগে তুমি কাউকে জানাবে না, আমিও জানাবো না।

হ্যাঁ, হতে পারে, সাজিদ বলে, আমিনকে বললেই হবে, ওর চেনাজানা এক কাজী সাহেব আছেন-

তাহলে তো সহজই হয়ে গেলো ব্যাপারটা, সীমা জানায়। বলে, কতো খরচ লাগবে জানো?

তা জানি না, আমিনকে বললেই ওসব ব্যবস্থা করে দেবে- কিন্তু কেন? এতো তাড়া কিসের?

ঐ যে তোমাকে বললাম, সীমা ফের বলে, আমার ওপর বারবার করে চাপ আসছে। বাড়ির লোকেরা টেনশনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, মা আর মামার সম্পর্ক বোধ হয় নষ্ট হয়ে যাবে- আমার খুব কষ্ট হয়, প্লিজ তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো-

সাজিদকে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হয়। জানাজানি হলে তাদের বাড়িতে খুব বেশি ঝামেলা হবে বলে তার মনে হয় না। শুধু মা-ই যা একটু আপত্তি করতে পারেন। যদি এর মধ্যে চাকরি-বাকরি কোথাও জোগাড় হয়ে যায় তাহলে সে আপত্তিটুকুও থাকবে বলে মনে হয় না।

দু'জনে শহীদ মিনার থেকে রিকশা চেপে সোজা চলে যায় নিউ হরাইজন কাগজের অফিসে। সেখানে আমিনের সঙ্গে কথা হয়। আমিন বাইরে বিরক্তি দেখালেও মনে মনে যে খুশি হয়েছে তা দু'জনেই টের পায়।

সীমা আমিনের হাত ধরে বলে, আমিন ভাই, কেউ যেন না জানতে পারে- প্লিজ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ জানবে না, আমিন আশ্বস্ত করে। বলে, টাকা-পয়সা কিছু আছে? নাকি তাও নেই!

আছে, সীমা জানায়। বলে, আমি যে প্রাইভেট টিউশন করি- তাতে হাজার দুয়েক টাকা জমেছে।

সাজিদ প্রতিবাদ করে। আমিনকে বলে, ওকে টাকার কথা কেন বলছিস? আমি আগে দেখি চেষ্টা করে।

আরে চেষ্টা পরে করিস। আগে শুভ কাজটা হয়ে তো যাক- পরে দেখা যাবে চেষ্টামেষ্টা করা যায় কি না। তিনজনে বসে বাইরের এক রেস্তরাঁয়। চা খাওয়া হয়। চা খেতে খেতে হালকা গল্প হয়। ওরই মধ্যে ঠিক হয়,পরদিন সকালবেলা আমিনের অফিসে আসবে সীমা। এই অফিস থেকে তারা সবাই পুরানা পল্টনের কাজী অফিসে চলে যাবে, সঙ্গে একজন মহিলা থাকলে ভালো হয়, সেই জন্য স্বাতীও সঙ্গে যাবে।

সীমার বাসায় ফিরতে রাত হয়ে যায়। ফিরে দেখে মামা-মামানি দু'জনেই মায়ের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। বেশ সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তা তিনজনের মুখের ভাব দেখেই আন্দাজ করা যায়। সীমাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে মামা-মামানি দু'জনেই ভ্রু কুঁচকে তাকান তার দিকে, মুখে কিছু বলেন না।

তাকে কিছু না বললে কি, পাশের ঘর থেকে সে দিব্যি শুনতে পায় যে তার সম্পর্কেই কথা হচ্ছে। নানান কথা, একটার পর একটা। যেমন প্রথম বিয়েতে ওর মত ছিলো না কেন? বলো? ছেলে শিক্ষিত, বয়স কম। চেনাজানা ফ্যামিলি তবু কেন মত ছিলো না?

মামানি এইরকম আরও বলে চললেন, তোমাদের উচিত ছিলো ওকে কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখানো। নাহলে আরও ভোগাবে ও। ওকে বলে দিও রাবু, যে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে, আগামীকাল সন্ধ্যায় তারিখ ঠিক করা হবে। আনসার সাহেব আসবেন মিসেসকে নিয়ে, বশিরুল্লাহও আসবে। ও যেন কোনোরকম পাগলামি না করে- যদি করে তাহলে আমাদের সঙ্গে তোমাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না- কথাটা যেন তোমার মেয়ে ভেবে দেখে, ও তো আর ছেলেমানুষ নয়, রেগুলার পড়াশোনা করলে দু'বছর আগে এমএ পাস করতো। আর যে বিয়েটা হয়েছিলো সেটা টিকলে দুই বাচ্চার মা হতো এতোদিনে। ওর শয়তানি আমরা আর সহ্য করবো না।

ঘরের ভেতর থেকে সীমা সব কথাই শোনে, আর মনে মনে তৈরি হয়ে যায় মা তাকে কী কী বলবেন যেসব শোনার জন্য।

খাওয়া-দাওয়া হয় নামেমাত্র। বলা যায় শুধু টেবিলে বসা হয় কিছুক্ষণের জন্য তারপর যার যার ঘরে। মা শুয়ে থাকা মেয়ের কপালে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, মা সব তো শুনলি তুই, বল, আমি কী করবো? আর পাত্রটাতো এমন কিছু খারাপ নয়। চিন্তা করে দেখ, আমার কথাও একটু ভেবে দেখ, তুই তো পরের ঘরে চলে যাবি, আজ হোক, কাল হোক, কিন্তু তখন যদি আমি ভাইয়ের আশ্রয় না পাই তাহলে আমার কী দশা হবে, তুই একটু ভেবে দেখ।

সীমা বালিশে মুখ ডুবিয়ে চুপ করে থাকে। শেষে বলে, মা আমি কাল

সকালেই বেরিয়ে যাবো, দুপুরে নাও ফিরতে পারি। ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে।

বিকেলে ফিরবে তো? মা আগ্রহে জিজ্ঞেস করেন।

বালিশে মুখে ডোবানো অবস্থাতেই সীমা বলে, হ্যাঁ, মা, ফিরবো, তুমি চিন্তা করো না।

পরদিন সকালে সে স্নান করে- তারপর দু'রাকাত নামাজও পড়ে নেয়। শেষে আলমারি থেকে শাড়ি বের করে, সুতিরই কিন্তু গোলাপি রঙের তাতে নকশার কাজ করা। মাকে বলে, মা তোমার কাঁকন জোড়া দেবে? আজ একটা আনুষ্ঠান আছে।

মা কাঁকন জোড়া তো দেনই, সেই সঙ্গে গলার হার দেন কানে ঝুমকো দেন, নাকে পাথর বসানো ফুল দেন।

কিসের অনুষ্ঠান? দূরে কোথাও যাবি?

আছে একটা অনুষ্ঠান। না দূরে যাবো না, কাছেই।

আটটার মধ্যেই সে নিজেকে ঢেকে ঢুকে রিকশায় চেপে বসে। বেরুবার সময় ব্যাগে টাকার ছোট বটুয়াটা নিতে ভোলে না।

তারপর ডেইলি হরাইজন অফিসের গেটে পৌঁছানো। সেখানে পৌঁছে দেখে তিনজনই অপেক্ষা করে আছে। আর একখানা রিকশা ডাকা হলে সাজিদ সীমার রিকশার দিকে পা বাড়ায়। তখন হাসতে হাসতে স্বাতী বাধা দেয়। বলে এখন আপনি ওখানে বসবেন না, আমি বসবো। অগত্যা এক রিকশায় দুই বান্ধবী আর অন্য রিকশায় দুই বন্ধু বসে। পাশে বসে স্বাতী একটু খুনসুটি করে। বলে, বিয়ে তো হবে, কিন্তু বাসর রাতের খবর কি? ওটা কি হবে?

সীমা মাথা নাড়ায়। বলে, জানি না, সব সাজিদ জানে।

বাহ্ সাজিদ ভাই কেন জানবে? আমি তো শুনলাম। তোর ইচ্ছেতেই বিয়েটা হচ্ছে এতো আগে, বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো তো পরে।

সীমার কথা বলতে ভালো লাগে না। বলে, বাদ দে ওসব, আমার কেমন যেন লাগছে।

তার মানে? স্বাতী মুখের দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, খারাপ লাগছে?

না, তা নয়, সীমা জানায়, কেমন যেন কান্না পাচ্ছে।

ও কিছু না, স্বাতী বান্ধবীর ঘাড়ে আস্তে করে চাপ দিয়ে বলে, বিয়ের সময় মেয়েদের ওরকম কান্না পায়- তুই কি কাঁদবি? কাঁদতে ইচ্ছে করলে কাঁদ?

সীমা এবার হাসে। বলে, তুই না পারিসও খুনসুটি করতে।

এটা এমন কিছু না, বিয়ের কনের পাশে বসলে সব মেয়েই খুনসুটি করতে পারে।

স্বাতী। সীমা ডাকে।

কিছু বলবি?

না তেমন কিছু না। আমি কি ঠিক করছি?

আরে ওসব চিন্তা কেন মাথায় ঢুকতে দিচ্ছিস এখন? হ্যাঁ তুই ঠিক করছিস, একশোবার বলবো ঠিক করছিস তুই, খুব সাহসের কাজ করছিস।

পুরানা পল্টনের কাজী সাহেব নমশেদ আলীর অফিসে সব কিছুই ঠিক করা ছিলো। কাবিনে নাম সই দোয়া দরুদ পড়া মোনাজাত করা সবকিছু শেষ হতে কোনোরকম দেরি লাগে না। সব মিলিয়ে ঘন্টা দেড়েকও বোধহয় লাগেনি। কাজীর অফিস থেকে বেরিয়ে তারা চারজন পল্টনের মোড়ে এক রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ খাওয়া-দাওয়া করে। তারপর আবার ত্রিচক্রযান- তবে আরোহীরা এবার যুগলবন্দী। নারী আর পুরুষ। প্রেমিক আর প্রেমিকা, প্রিয়তমা আর প্রিয়তমা। যেভাবেই দেখা যাক ওরা যুগলই।

সাজিদের পাশে বসে কান্না পায় সীমার। কান্নাটা আনন্দের না বেদনার সে বুঝতে পারে। কারণ তার বুকের ভেতর কষ্ট হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো পাশের মানুষটাকে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকলে বোধহয় তার বুকের কষ্টটা আর থাকবে না।

তার খোঁপা বাঁধা মাথা তখন সাজিদের ঘাড়ে হেলানো আর সাজিদের বাম হাত তাকে বেড় দিয়ে ধরে রেখেছে। তবু তার বারবার মনে হচ্ছিল কেন তাকে আরো জোরে চেপে ধরছে না কেন তার স্বামী।

হ্যাঁ স্বামী। সীমা নজর তুলে দেখে, বহুবার দেখা, তবু দেখে। চিবুক, ঠোঁট, নাক, ভ্রূ, কপাল, চোখ। বারবার করে দেখে এই পুরুষ মানুষটা তার স্বামী। তার মনের ভেতরে কে একজন বারবার করে বলতে থাকে, এই যুবকটা তোর স্বামী, এই পুরুষটা তোর স্বামী। এই সাহসী লোকটা তোর স্বামী।

এদিকে সাজিদের মনের অনুভূতি যতো না সজাগ, দেহের অনুভূতি তার চাইতে বেশি। একটি যুবতী মেয়ে মানুষের শরীর সে একহাতে জাপটে ধরে আছে, নরোম আর উষ্ণ লাগছে তার স্পর্শ- অদ্ভুত ধরনের একটা গন্ধও তার ঘ্রাণে আসছে। মেয়েদের শরীরে কি গন্ধ থাকে? না এ গন্ধ স্নো পাউডারের মতো নয়, এ গন্ধ অনেক বেশি মধুর। অনেক বেশি গাঢ়, আর অনেক বেশি মদির।

আমিন আর স্বাতীর রিকশা অনেক আগেই ধানমন্ডির রাস্তা ধরেছিলো। এখন তারা দু'জন ফিরছে। নাকি ফিরছে না, নতুন কোথাও যাচ্ছে? সেখানে তাদের সারাজীবন থাকতে হবে। নানান চিন্তা অনুভূতি আবেগের মধ্যে ওলট-পালট খেতে খেতে তারা কলোনির মোড়ে পৌঁছায়। সাজিদ নামলে সীমা বলে, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি, তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় যাবো।

যাবে তো এখনই চলো, বাসায় যাবার কি দরকার?

বুদ্ধু কোথাকার! সীমা হাসে। বলে, দেখতে পাও না, কতোসব গয়না গায়ে? আমি এখনই এসে যাবো, দেরি হবে না।

সত্যি সত্যিই দেরি হয় না, মিনিট দশেকের মধ্যে একই রিকশায় ফিরে আসে সীমা।

সাজিদ রিকশায় উঠে বসলে আবার বলে, হোটেল শেরাটনে চলো, রিকশাঅলা।

রিকশাঅলা হেসে ওঠে। বলে, ঐ রাস্তায় তো রিকশা যাইতে দেয় না আপা, আপনে জানেন না?

অগত্যা রিকশা ছেড়ে বেবিট্যাক্সিতে উঠতে হয়। গাড়ি চলতে শুরু করলে, সীমা নিজের প্ল্যানটা জানায়। তোমাকে ভড়কে দিতে বলেছিলাম না লোকটাকে। তুমি তো পারোনি আজ আমি কেমন ভড়কে দিই তুমি দেখো।

কিন্তু ওকি এখন হোটেলে থাকবে?

কালরাতে টেলিফোনে তো বললো যে থাকবে।

তুমি টেলিফোন করেছিলে?

হ্যাঁ করেছিলাম। সীমা হাসতে হাসতে জানায়।

আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা গন্তব্যে পৌঁছে যায়। এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখাও হয়।

বশিরুল্লাহ তার রুমে বসায় না, লাউঞ্জে নিয়ে বসায়। তারপর সাজিদকে দেখতে দেখতে বলে, তুমি না আগে একবার এসেছিলে? আবার কেন? কী চাও এখানে?

উনি আমার সঙ্গে এসেছেন, সীমা জানায়।

ও, তাই নাকি? তা কী খবর বলো? খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে কথা বলে বশিরুল্লাহ, প্রথম দিন সীমাকে আপনি বলছিলো আজ তুমি বলছে। বলে, আজ বোধহয় আমাকে তোমাদের বাড়িতে বিকেল বেলা যেতে হবে, তাই না?

আমি ঠিক জানি না, সীমা জানায়। তারপর বলে, হ্যাঁ যে জন্য এসেছি, আচ্ছা

মিষ্টার বশিরুল্লাহ, মীনু আপা যে ডিভোর্স দিয়েছেন আপনাকে, সেটা কোন কারণে?

সীমার কথা শুনে বশিরুল্লাহর চোখ-মুখের চেহারা পাল্টে যায়। বলে, কী মীনু? কার কথা বলছো তুমি?

উত্তরে সীমা হাসে। বলে, আপনার স্ত্রীর কথা বলছি আমি।

আমার কোনো স্ত্রী নেই।

হ্যাঁ, এখন নেই, কিন্তু বছর দুই আগে ছিলো। যার সঙ্গে আপনি দীর্ঘ পনেরো বছর সংসার করেছেন, যার গর্ভে দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

মিথ্যা কথা। সব বানানো গল্প। কে বলেছে এসব কথা! বশিরুল্লাহ এবার আর উত্তেজিত হয় না। ঠাণ্ডা গলায় বলে, কার কাছে এসব মিথ্যা কথা শুনে এসেছো, সেটা বলছো না কেন? নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কেউ শত্রুতা করে এসব বলছে, সব মিথ্যা।

সীমা লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নজর স্থির রেখে ফের বলে, মিথ্যা না সত্যি তা তো ব্রিটিশ হাই কমিশনে খোঁজ নিলে পাওয়া যাবে। তাছাড়া ফরেন অফিসে চেনাজানা লোক পাওয়া গেলে ঐ লোকই লন্ডনের বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে খবরটা আনতে পারে, পারে না? বলুন? একটা পুলিশ কেসও তো হয়েছিলো, আপনার প্রথম সন্তান নাবিলার টেলিফোন পেয়ে পুলিশ যখন বাসায় যায় তখনও আপনি মীনু আপাকে পেটাচ্ছিলেন, ঘরের দরজা বন্ধ করে।

মিথ্যে কথা! নিজের স্ত্রীকে কোনো ভদ্রলোক পেটায়?

ও, আপনার স্ত্রী তাহলে উনি, এবারে সাজিদ কথা বলে।

হু আর ইউ! বশিরুল্লাহ রেগে যায়। বলে, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। নাহলে আমি গার্ডদের ডাকবো।

সে আপনি যা ইচ্ছে করুন। সাজিদ আবার হেসে ওঠে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, আপনার সব খবর জানতে মোটেও দেরি লাগবে না। আপনি নিজের আসল পরিচয় গোপন করে, মিথ্যা কথা বলে, বিয়ে করতে যাচ্ছেন এজন্য তো এদেশেও পুলিশ কেস হতে পারে। সেটাও আপনি নিশ্চয় জানেন।

নাউ গেট আউট! বশিরুল্লাহ দাঁড়িয়ে যায়। বলে, আই ও'ন্ট টক।

কথা কটা বলেই সে নিজের কামরার দিকে চলে যায়।

এরাও ফেরে। হাসতে হাসতে দু'জনে হোটেল থেকে বের হয়। সাজিদ তার কোচিং সেন্টারের সামনে নেমে যায় কাকরাইলের কাছে, আর সীমা ভারমুক্ত মন নিয়ে বাসায় ফেরে।

এদিকে বিকেল থেকেই মামা-মামানি অতিথি আপ্যায়নের জন্য তৈরি। আয়োজন একেবারে খারাপ নয়। মামানি সাধারণত রান্নাঘরে যান না। তিনিও আজ রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। আর মা তো রোজকার মতো ছিলেনই।

আনসার সাহেব আর তাঁর মিসেস এসে গেলেন যথাসময়েই। তাঁরা আলাপও শুরু করে দিলেন।

এ মাসের শেষ শুক্রবার না, সামনের মাসের প্রথম শুক্রবার। কোন শুক্রবার আপনাদের পছন্দ? আনসার সাহেব, পছন্দ মতো তারিখ কোনটা তা জানতে চান?

মামা-মামানি উত্তর দেন না, মায়ের মুখের দিকে তাকান। মাও সোজাসুজি বলতে পারেন না। কোন তারিখের কথা বলবেন, বিয়ের মতো অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজন করতে হবে না? আর ঐ রকম বড় আয়োজনের তিনি কী বোঝেন? তিনি একবার এর মুখের দিকে একবার ওর মুখের দিকে তাকান। তখন সীমা হাসতে হাসতে মায়ের পেছন থেকে বলে ওঠে, আমাদের দুটো তারিখই পছন্দ। আপনারা যেদিন বলবেন, সেদিনই অনুষ্ঠান হবে, আপনারাই বলুন কোন তারিখ হলে আপনাদের সুবিধা।

সীমা কথা শেষ করে সকৌতুকে আনসার দম্পতির দিকে তাকিয়ে থাকে আর মিটি মিটি হাসে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সে আবার তাগিদ দেয়। বলে, কী হলো, বলুন কিছু একটা!

কিন্তু ঐ তাগিদ সত্ত্বেও পাত্রপক্ষের জবাব পাওয়া যায় না। আনসার সাহেব বলেন, হ্যাঁ বলছি। একটু পরই বলবো, বশির এখনই এসে যাবে।

ঠিক আছে, তাহলে উনি আসুন, সীমা বলে। তারপর জিজ্ঞেস করে ওর তো পাঁচটার সময় আসবার কথা, তাই না?

হ্যাঁ, সেরকমই তো কথা হয়েছে গতকাল সকালে, আনসার সাহেব জানান।

এদিকে মাহতাব সাহেব আর তাঁর গিন্নি দু'জনেই খুশিতে একেবারে বাগবাগ। কারণ আজ দেখছেন ভাগ্নি নাসিমা শাহেদ একেবারে অন্য মেয়ে। নিজের বিয়ের তারিখ নিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। দেখে মনে হয় এই বিয়েতে সবচাইতে বেশি আগ্রহ তারই।

দেখতে দেখতে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। রাবেয়া পাশের ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ে আসেন। তারপর আনসার দম্পতিকে বলেন, নামাজ পড়তে চাইলে ও ঘরে যান। ওখানে জায়নামাজ বিছানো আছে।

কিন্তু কেউ নড়ে চড়ে না। যে যেমনকার বসেছিলেন, সেইভাবেই বসে রইলেন।

ঐ সময় মামানিকে উসখুশ করতে দেখা যায়। আনসার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, কী হলো আনসার ভাই, সাড়ে ছয়টা বেজে গেলো, কিন্তু আপনাদের পাত্র কোথায়?

আনসার ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়েন। বলেন, দেখুন কাল সকালে মুখোমুখি বসে কথা হয়েছে কিছু ঘটে গেলে কি না কে জানে।

তাহলে টেলিফোন করুন। মামানি বলেন, ফোন করতে তো অসুবিধা নেই।

আনসার সাহেব উঠে গিয়ে টেলিফোন সেটে ডায়াল করেন। তারপর হুঁ হাঁ করেন কিছুক্ষণ। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, আজকের প্রোগাম হবে না, আমি দুঃখিত।

সে কি! সবাই একসঙ্গে বিস্ময় উচ্চারণ করেন। বলেন, কেন? আনসার সাহেব বলেন, ও নেই, বিকেল বেলা হোটেল ছেড়ে চলে গেছে।

এটা কী বলছেন, মাহতাব সাহেব রীতিমতো রেগে ওঠেন। এভাবে কেন চলে যাবে।

আর ঐ সময় সীমা বলে ওঠে, না মামা, উনি চলে যাননি, পালিয়ে গেছেন। কারণ তিনি খুব বাজে লোক। তার বিয়ে হয়েছিলো, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। বউকে মারধর করতেন বলে বছর দুই আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে- আর সব কিছু তিনি গোপন করে দেশে বিয়ে করতে এসেছিলেন- এখন ওকে আর পাওয়া যাবে না। খামোকা চেষ্টা করে লাভ হবে না।

কথা কটা বলে সীমা খুব ধীর পায়ে নিজের ঘরের ভেতরে ঢোকে। সেদিনই অনেক রাতে মায়ের চোখে যখন ঘুম নেই, মনে খুব দুশ্চিন্তা, ঐ সময় সীমা মায়ের বুকে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কাঁদে না, নড়ে চড়ে না, একেবারেই স্থির তথা মেয়ের সারাদেহ। ঐ সময় মায়ের ঘাড়ে জড়ানো হাত দুটো থেকে যেন বেশি চাপ নেমে আসে আর তখন রাবেয়া শুনতে পান, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রেখেই মেয়ে বলছে, মা, ওমা, শোনো, আজ আমি সাজিদকে বিয়ে করেছি।

** এই উপন্যাসের কাহিনী চরিত্র ঘটনাবলী সবই কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল থাকলে তা লেখকের অনভিপ্রেত বুঝতে হবে।*

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**